ঐতিহাসিক সোনারগাঁ

একেএম মুজ্জাম্মিল হক

সম্পাদক: রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঐতিহাসিক সোনারগাঁ

একেএম মুজ্জাম্মিল হক

সম্পাদক
রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ঐতিহাসিক সোনারগাঁ
একেএম মুজ্জাম্মিল হক
সম্পাদক
রবীন্দ্র গোপ
পুনমুদ্রণ
শ্রাবণ ১৪২৩/জুলাই ২০১৬
প্রকাশকাল
মাঘ ১৪২২/ফেব্রুয়ারি ২০১৬
মুদ্রণ সংখ্যা
১০০০ কপি
প্রকাশক
রবীন্দ্র গোপ
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রচ্ছদ
রবীন্দ্র গোপ
একেএম আজাদ সরকার
আলোকচিত্র
মো. শফিকুর রহমান
একেএম মাসুদ
মুদ্রণ
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ০১৭১১৬০২৪৪২
মূল্য
পাঁচশত টাকা মাত্র

HISTORIC SONARGAON AKM MUZZAMMIL HAQUE
Editor Rabindra Gope
Published by Rabindra Gope, Director, Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation, Sonargaon, Narayanganj, Bangladesh.
Reprint July 2016, Price : Tk. 500 Only U.S. Dollar 10
ISBN : 978-984-34-0277-6

উৎসর্গ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
তাঁর প্রথম আর্থিক সাহায্য, পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ
একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

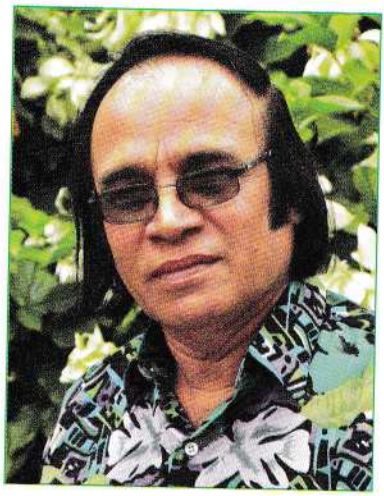

সামান্য নিবেদন

সোনারগাঁও বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয়কে চিরভাস্বর করার প্রত্যয়ে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের শ্রমে-ঘামে সৃজনশীলতায় গড়ে ওঠে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রবহমান রাখার প্রয়াসে দেশের লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনই এর লক্ষ্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শ ও অর্থ-সাহায্যে এবং এ দেশের মাটি ও মানুষের শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্থাপন করেন শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর। আবারও আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প আইন মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয় এবং ৬ মে ১৯৯৮ তারিখের গেজেটে তা প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালে সোনারগাঁয়ে কারুশিল্পগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের কাজও আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই সম্পন্ন হয়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পুনর্বার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের

আওতায় ফাউন্ডেশনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, 'বনছায়া' অফিসার্স কোয়ার্টার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, ছায়ানীড় স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ, গাড়ি পার্কিং ময়দান নির্মাণ, কারুপল্লী এলাকা উন্নয়ন, প্রধান গেইট নির্মাণ, টিকিট কাউন্টার কাম গার্ড হাউস নির্মাণ, মিউজিয়াম ও প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, অভ্যন্তরীণ আলোকিত করণ কাজ, পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ফাইবার গ্লাসের প্যাডেল বোট, ভিডিও স্টিল ক্যামেরা ও ইমারজেন্সি জেনারেটর ক্রয়, কারুপল্লীতে ৪৮টি স্টল নির্মাণ, ময়ূরপঙ্খী নৌকার আদলে 'সোনারতরী' মঞ্চ নির্মাণ, আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ আসবাপত্র এবং জাদুঘর নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে।

এছাড়া ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখের পুষ্পিত বাগানে শিল্পী শ্যামল চৌধুরী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণদানের আদলে তামার তৈরি সর্বোচ্চ ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। এটি সোনারগাঁও এলাকার জনগণের জন্য সর্বোপরি বাঙালি জাতির জন্য গৌরবের বিষয়। ফাউন্ডেশন দেশীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি পর্যটকদের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যের স্মারক চিহ্ন যুগ যুগ ধরে বাঙালির গৌরবগাঁথা তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ফাউন্ডেশন চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল-এর ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে ইতোমধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৩৮ বছর পর ২০১২ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, কর্মচারিগণের জন্য অবসরকালীন পেনশন ভাতা প্রবর্তনও করেছে বর্তমান সরকার।

এছাড়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের মধ্যে ফাউন্ডেশনের লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর-বড় সরদার বাড়ির রেস্টোরেশন কাজের ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ ধরনের চুক্তি বাংলাদেশে এটিই প্রথম। চট্টগ্রাম কেইপিজেডের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মি.কিহাক সাং বাংলাদেশ-কোরিয়া'র সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের রাজসিকতা ফিরিয়ে আনতে অনন্য ভূমিকা রাখবেন বলে আমার বিশ্বাস। রেস্টোরেশন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বাংলার প্রাচীন রাজধানীর জৌলুস পুনরায় পর্যটকগণ অবলোকন করতে পারবেন।

বাঙালি সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বিগত ছয়বছরব্যাপী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মাসে দু'দিন শিশুদের মাঝে চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি ও

নাচ শিক্ষার বিশেষ আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে সোনারগাঁ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল, কিন্ডার গার্টেন-এর ক্ষুদে আঁকিয়ে, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যশিল্পীরা অংশগ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে ফাউন্ডেশন অয়োজিত শিশুদের শিক্ষামূলক এ অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য চ্যানেলে সম্প্রচারিত হওয়ায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এটি প্রতি সপ্তাহে আয়োজন করার দাবি উঠেছে।

প্রতি বছর এই উপমহাদেশের দর্শনীয় স্থান সোনারগাঁ পরিভ্রমণে আসেন প্রায় দশলক্ষ দেশি-বিদেশি পর্যটক। অদূর ভবিষ্যতে ফাউন্ডেশনটির আরো সৌন্দর্য বর্ধন এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা ও গবেষণার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানের গাইড লেকচারার জনাব একেএম মুজ্জাম্মিল হক রচিত 'ঐতিহাসিক সোনারগাঁ' বইটিতে ইতিহাসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উল্লেখ করেননি। তাই বইটি পুনমুদ্রণ করতে হলো। লোকশিল্পের বিকাশ ও প্রসারে প্রতিবছর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের বর্ণিল আয়োজন করা হয়। এ ধরনের উৎসব সাম্প্রদায়িকতা, কূপমুণ্ডকতা, কুসংস্কার এবং জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করে বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখবে যা আমাদেরকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিবে।

একটি বিষয় কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করতেই হয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর ইতিহাস নির্ভর এমন একটি প্রকাশনা করার জন্যে দীর্ঘদিন থেকেই তাগিদ দিচ্ছিলেন। তাঁর উপদেশ নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করেছি। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব আক্তারী মমতাজ যখনই দেখা হয়েছে তখনই বলেছেন গবেষণা কাজ বাড়াতে হবে। তাঁরই অনুপ্রেরণা পেয়ে আমরা ইতোমধ্যে নকশিকাঁথার উপর মাসব্যাপী প্রদর্শনী ও একটি উল্লেখ্যযোগ্য স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি ইতিহাস ভিত্তিক এই গ্রন্থটি। আমাকে সার্বিক সাহায্য করেছেন প্রতিষ্ঠানের উপপরিচালক জনাব মো. রবিউল ইসলাম ও ডিসপ্লে অফিসার জনাব একেএম আজাদ সরকার।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন তাৎপর্যের দিক থেকে বাংলাদেশেরই ক্ষুদ্রাকার অবয়ব বলা চলে। এখানে রূপসী বাংলাদেশের অপরূপ প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করা যায়। এ ফাউন্ডেশন প্রতিনিধিত্ব করছে হাজার বছরের লোকমানুষের পরম্পরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির।

ঐতিহ্যের ক্রমপুঞ্জিত ধারায় আয়োজিত ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব এখন একটি প্রতিষ্ঠিত মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। লোকজ ঐতিহ্যকে অকৃত্রিমভাবে উপস্থাপন করা আর নতুন প্রজন্মের কাছে এর পরিচিতি তুলে ধরতে ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবের সমারোহপূর্ণ আয়োজন। মাসব্যাপী লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসবে ব্যাপক পণ্যসামগ্রীর সমারোহ ঘটে লোক ও কারুশিল্পকে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করার প্রয়াসে মেলায় দেশের প্রত্যন্ত এলাকার কারুশিল্পীরা স্বচ্ছন্দে তাদের পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে এতে কারুশিল্পের বাজার সম্প্রসারিত হবে। ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী দীর্ঘ আয়োজনে গ্রাম-বাংলার চিরায়তরূপ তুলে ধরা হয়। প্রতিদিন দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পর্যটক ফাউন্ডেশনের এই বৃহৎ আয়োজন পরিদর্শনে আসেন। উল্লেখ্য যে, বাংলানববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রায় ষাট হাজার দর্শনার্থী বর্ণাঢ্য বর্ষবরণ উৎসব উপভোগ করেন। এ উপলক্ষে প্রতিবছরই ৩দিনব্যাপী বসে গ্রামীণ লোক মেলা। প্রতিদিনই বিকেলে বসে বাউলের আসর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলার ঐতিহাসিক সোনারগাঁ তারই ঐতিহ্য লালিত এ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

সম্পাদক
রবীন্দ্র গোপ
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আমার কথা

সোনারগাঁ বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। সোনারগাঁ জাতির ইতিহাস সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শুর, পাল, দেব রাজাদের সময় এবং ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে সোনারগাঁ প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। মসলিনখ্যাত নগরী হিসেবে সোনারগাঁয়ের পরিচিতি বিশ্বব্যাপী।

১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর নগর– ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে সোনারগাঁয়ের গুরুত্ব ম্লান হয়ে যায়। সোনারগাঁও প্রাচ্যের ড্যান্ডিখ্যাত নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ বৈদ্যেরবাজার থানা থেকে সোনারগাঁ থানা এবং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে থানা থেকে সোনারগাঁ উপজেলায় উন্নীত হয়। এর আয়তন ১৭১.০৫ বর্গকিলোমিটার। নারায়ণগঞ্জ জেলা সদর হতে এটি প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সোনারগাঁয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং কালচারাল হেরিটেজ প্রত্যক্ষ না করলে অপূর্ণতা থেকে যায়।

এই গ্রন্থটিতে সংযোজিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র সোনারগাঁয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়াস মাত্র। ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতিসমৃদ্ধ পুষ্প-পল্লব বৃক্ষরাজিশোভিত নদীনালা পরিবেষ্টিত অঞ্চল সোনারগাঁও। যুগে যুগে এখানে ঘটেছে রাজপুরুষদের আনাগোনা, পরিব্রাজকদের পদচারণা। একদা এখানে বাস করেছেন প্রভাবশালী জমিদার। সোনারগাঁ প্রাচীন বাংলার রাজধানী থাকায় এখানে শুভাগমন করেছেন সুফি সাধক, যোগী মুনী-ঋষী। তাঁদের হাতে গড়া বহু কীর্তি সোনারগাঁয়ের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও পেশাজীবী মানুষের সম্মিলিত আবাসস্থল সোনারগাঁও।

সোনারগাঁও পরিদর্শনে আসা সাধারণ মানুষ, সম্ভাবনাময় মানুষ, সৃজনশীল মানুষ, অনুসন্ধিৎসু-দ্রোহী মানুষই আমার *ঐতিহাসিক সোনারগাঁ* শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের প্রেরণার উৎস।

সোনারগাঁয়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা অনুপম স্থাপত্যশৈলী ও মনোলোভা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অম্লান রাখতে সবিনয় অনুরোধ জানাই। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সোনারগাঁয়ের সীমানার বাইরের কিছু প্রাচীন তথ্য আলোচিত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ভ্রমণপিপাসু ও ঐতিহ্যপ্রেমী মানুষের জন্য আমাদের যে হাজার

বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং বিশ্বের দরবারে গর্ব করার মতো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। এটি তুলে ধরার প্রয়াস *ঐতিহাসিক সোনারগাঁ* গ্রন্থে নেয়া হয়েছে।

বছরে প্রায় দশ লক্ষ দেশি-বিদেশি পর্যটক সোনারগাঁও পরিভ্রমণে আসেন। এর মনোলোভা স্থাপত্যশৈলী পরিদর্শন করতে গিয়ে অপরিচিতির কারণে অনেকে বিড়ম্বনায় পড়েন। আবার ধারণার অভাবে কাঙ্ক্ষিত নিদর্শন অবলোকনে ব্যর্থ হন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হলো *ঐতিহাসিক সোনারগাঁ* গ্রন্থ।

ঐতিহাসিক সোনারগাঁ গ্রন্থ রচনায় সবকিছু সঠিক হয়েছে এ দাবি আমি করবো না। নিজের অজান্তে একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা শীর্ষক আলোচিত গ্রন্থে ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সাধারণ দর্শকের কাছে *ঐতিহাসিক সোনারগাঁ* গ্রন্থটি গ্রহণযোগ্য, সমাদৃত এবং অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণপিপাসু পর্যটকগণের নিকটও এটি আদৃত হবে বলে প্রত্যাশা করি।

একেএম মুজ্জাম্মিল হক
গাইড লেকচারার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচি

১. মানচিত্রে সোনারগাঁয়ের অবস্থান ১৪
২. স্মৃতি বিজড়িত রাজস্ব আদায় ভবন, সোনারগাঁ ১৭
৩. সোনারগাঁও ধ্বংসাবশেষের স্থাপত্যচিহ্ন ২১
৪. মুঘল ও ব্রিটিশ আমলে নির্মিত পানামের ইমারতের স্থাপত্যশৈলী ২৪
৫. পানামসিটি পরির্দশনে পর্যটক ৩৩
৬. পানাম সিটির সারিবদ্ধ ইমারত ৩৫
৭. নীলকুঠি ৩৬
৮. আমিনপুর মঠ ৩৭
৯. পুরোনো রেস্ট হাউস ৩৮
১০. নাচঘর ৩৯
১১. পঙ্খীরাজ খাল ৩৯
১২. দরবার হল ৪০
১৩. রেস্ট হাউজের অভ্যন্তর ভাগ ৪০
১৪. অলঙ্কৃত ইমারত ও কাশিনাথ ভবন ৪১
১৫. পানাম সিটির পরিখা ৪১
১৬. পানাম সিটির প্রাচীন ইমারত ৪২
১৭. পানাম ব্রিজ ৪৩
১৮. ক্রোড়ি বাড়ি ৪৪
১৯. পোদ্দার বাড়ির মূল ভবন ৪৫
২০. বালুয়াদিঘিরপাড় জামে মসজিদ ৪৭
২১. সোনারগাঁ জি.আর.ইনস্টিটিউশন ৪৮
২২. সংস্কারের পূর্বে ছাদভাঙ্গা গোয়ালদি মসজিদ ৪৯
২৩. সংস্কারের পর গোয়ালদি মসজিদ ৫০
২৪. শাহ্ আবদুল হামিদ মসজিদ ৫৩
২৫. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ৫৪
২৬. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য পরির্দশন করেন বিদেশি পর্যটক ৫৬
২৭. লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ৫৮
২৮. শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ৫৯
২৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর উদ্বোধন করেন ৬০
৩০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করেন ৬০
৩১. কারুশিল্পগ্রামে কর্মরত শিল্পী ৬২
৩২. লেকে মাছ শিকার ৬৩
৩৩. লেকের জলে বাউলের আসর ৬৪
৩৪. লোকশিল্পের বিপণন কুটির ৬৪
৩৫. ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে দর্শনার্থী ৬৫

৩৬. ছোট সরদারবাড়ি সংস্কারের পূর্বে ৬৬
৩৭. ছোট সরদারবাড়ি সংস্কারের পরে ৬৬
৩৮. নকশি কাঁথায় বাংলাদেশ ৬৭
৩৯. সোনারগাঁয়ে তৈরি কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া ৬৮
৪০. কিংবদন্তি কারুশিল্পী মনীন্দ্রচন্দ্র সূত্রধর ৬৮
৪১. জামদানি শাড়ি ৬৯
৪২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ৭০
৪৩. শিল্পাচার্য জয়নুল ভাস্কর্য ৭১
৪৪. শেখ রাসেল ভাস্কর্য ৭২
৪৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনে ক্ষুদে আঁকিয়ে ৭৩
৪৬. শখের হাঁড়ি শিল্পী ৭৩
৪৭. কাঠের নকশি দরজা ৭৪
৪৮. লোক ও কারুশিল্প গ্রন্থাগার ৭৫
৪৯. সোনারতরী মঞ্চ ৭৫
৫০. ফাউন্ডেশনের প্রধান গেইট ৭৬
৫১. নাগরদোলা ৭৬
৫২. জাদুঘর পরিদর্শনে মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ৭৭
৫৩. জাদুঘর গ্যালারির একাংশ ৭৭
৫৪. গাজীর পট ৭৮
৫৫. পিতলের ঘোড়া ৭৮
৫৬. রূপার আতরদানি ৭৯
৫৭. পিতলের হাতি ৭৯
৫৮. পিতলের নিদর্শন ৮০
৫৯. লোকজ উৎসবের বিশেষ আয়োজন লোকজীবন প্রদর্শনী ৮১
৬০. ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর কারুশিল্পী ৮১
৬১. ঐতিহাসিক যাত্রাপালা ঈশা খাঁ মঞ্চায়ন দৃশ্য ৮২
৬২. বিদেশি পর্যটক ৮২
৬৩. বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজের ভিত্তি প্রস্তরের ফলক উন্মোচন ৮৩
৬৪. রেস্টোরেশনের পূর্বে বড় সরদারবাড়ি ৮৪
৬৫. মুঘল আমলে নির্মিত কুলঙ্গি ৮৬
৬৬. বড় সরদারবাড়ির স্থাপত্যশৈলী ৮৭
৬৭. প্রসঙ্গ ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা ৯৩
৬৮. ঈশা খাঁর জঙ্গলবাড়ির একাংশ ৯৫
৬৯. ঈশা খাঁর নির্মিত মসজিদ ৯৬
৭০. ঈশা খাঁর সমাধি ৯৬
৭১. ঈশা খাঁ কামান ৯৭
৭২. নুসরত শাহ'র সোনারগাঁও শিলালিপি ৯৮
৭৩. ঈসা খানের কামানের লেখা ৯৮
৭৪. মহেন্দ্রদেব ও রাজা দনুজমর্দন নাম অঙ্কিত মুদ্রা ৯৮০
৭৫. ঐতিহাসিক খাসনগর দিঘি ১০০
৭৬. মসলিনের বুননশৈলী ১০১
৭৭. A woman in Dhaka clad in fine Bangali muslin ১০২

৭৮. জামদানি তাঁতে কর্মরত শিল্পী ১১০
৭৯. গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ১১৩
৮০. পিঠাওয়ালির পুল ১১৪
৮১. বিজয়ের স্মৃতি ১১৫
৮২. বাড়ি মজলিশ মসজিদ ১১৬
৮৩. ইউসুফগঞ্জ মসজিদ ১১৭
৮৪. ভূগর্ভস্থ প্রার্থনা কক্ষ ১২০
৮৫. নহবতখানা ১২১
৮৬. দরগাবাড়ি কমপ্লেক্স ১২২
৮৭. ইব্রাহিম দানিশমান্দের সমাধি ১২৩
৮৮. শেখ মুহাম্মাদ ইউসুফ ও শেখ মাহমুদের সমাধি ১২৩
৮৯. শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা'র সমাধি ১২৫
৯০. দাড়োগোল্লা মসজিদ ১২৬
৯১. গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ্'র সমাধি সৌধ ১২৮
৯২. গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ্'র সমাধি ১২৮
৯৩. কাজী সিরাজ উদ্দিন এর সমাধি ১৩০
৯৪. পাঁচ পীর সমাধি ১৩১
৯৫. কদম রসুল সৌধ ১৩৩
৯৬. সোনাকান্দা দুর্গ ১৩৪
৯৭. সোনাকান্দা দুর্গের গেইট ১৩৪
৯৮. বিবি মরিয়ম সমাধি সৌধ ১৩৫
৯৯. হাজীগঞ্জ দুর্গ ১৩৬
১০০. বাবা সালেহ মসজিদ ও সমাধি ১৩৬
১০১. সনাতন ধর্মালম্বীদের লাঙ্গলবন্দে পুণ্যস্নান ১৩৮
১০২. দেওয়ানবাগ মসজিদ ১৪০
১০৩. মহজমপুর মসজিদের আদিরূপ ১৪১
১০৪. সুলতানি আমলে নির্মিত মহজমপুর মসজিদ ১৪১
১০৫. মহজমপুর মসজিদের গম্বুজ ১৪২
১০৬. মসজিদের দেয়ালে ফুলেল নকশা ১৪২
১০৭. মিহরাবে অলংকৃত পাথরের পিলার ১৪২
১০৮ লঙ্গর শাহের শবাধার ১৪৩
১০৯. লঙ্গর শাহের সমাধি সৌধ ১৪৩
১১০. শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম ১৪৪
১১১. বারদী মঠ ১৪৫
১১২. শ্রী জ্যোতি বসুর বাড়ি ১৪৬
১১৩. চীন-এর বিখ্যাত পর্যটক মাহুয়ান ১৫০
১১৪. মাহুয়ান-এর পরিভ্রমণ মানচিত্র ১৫১
১১৫. ইংরেজ পর্যটক রালফফিচ ১৫২
১১৬. ইবনে বতুতার বিশ্ব পরিভ্রণ মানচিত্র ১৫৪
১১৭. বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৫৫
১১৮. বাংলায় বিদেশি পর্যটক টাভার্নিয়ার ১৫৮
১১৯. সোনারগাঁয়ের লোকেশন মানচিত্র ১৬০

মানচিত্রে সোনারগাঁয়ের অবস্থান

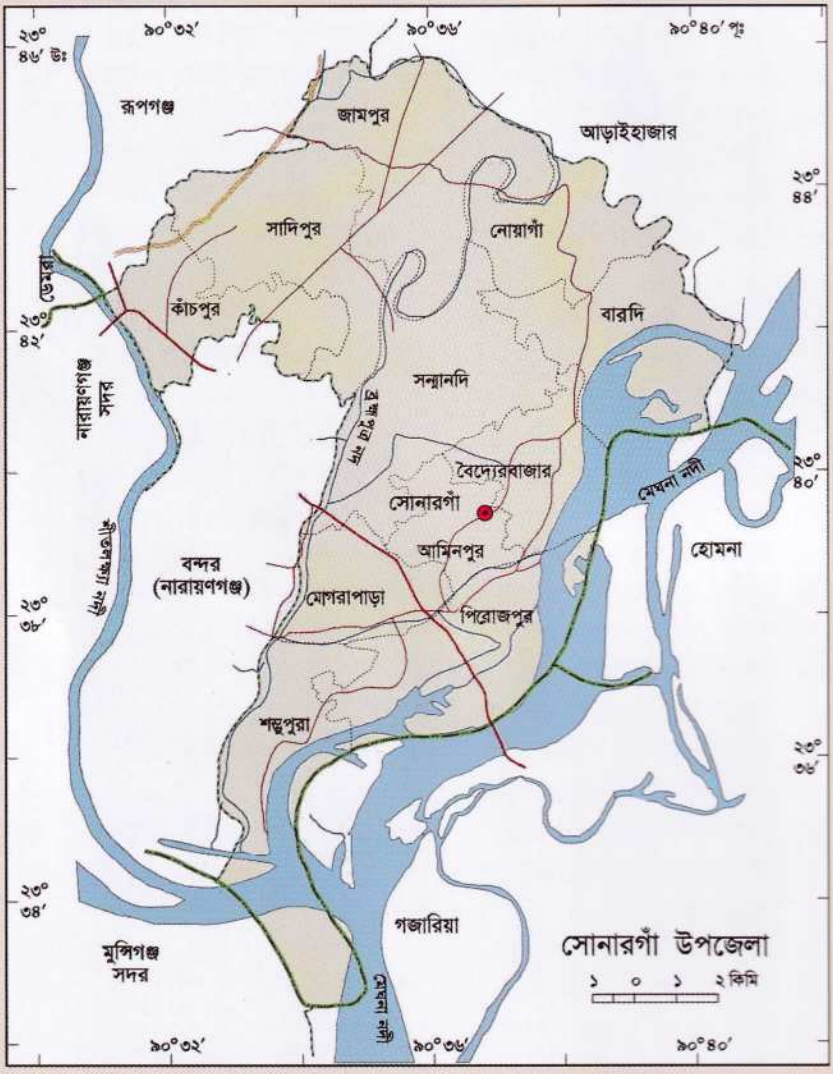

সোনারগাঁও পরিচিতি

বাংলার প্রাচীন রাজধানী শহরের এক স্মৃতিময় নাম সুবর্ণগ্রাম। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবারিত আকর্ষণ, অনুপম স্থাপত্যশৈলী ও প্রাচীন নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ পর্যটকদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

ঢাকার অদূরে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দু'পাশ জুড়ে সবুজের সমারোহ আর বনানীর শ্যামলিমায় মনোরম স্থাপত্যশৈলী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা, হৃদয় ছোঁয়া এক নৈসর্গিক পরিবেশে সোনারগাঁয়ের অবস্থান। সোনারগাঁয়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য আমাদের গর্বের বিষয়। অতীত স্মৃতিতে অম্লান সুবর্ণগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ আজ অবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সোনারগাঁয়ের কোথাও অতীতের স্মারক চিহ্ন তেমন অবলোকন করা যায় না। এই সোনারগাঁয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সোনালি অতীতের এক সুবর্ণ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য স্মৃতি।

সোনারগাঁ নামের উৎপত্তি : সোনারগাঁ নামের উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। গবেষকদের মতে, সোনারগাঁয়ের প্রাচীন নাম সুবর্ণবীথি বা সুবর্ণগ্রাম। এই সুবর্ণগ্রাম থেকেই সোনারগাঁ নামের উদ্ভব বলে জানা যায়।

ড.এসএম হাসানের মতে "Sonargaon or more accurately known from ancient times, 'Suvarnagram' literally means 'Golden village'. In common parlance it is also called 'Gold Town` which proves that the terminology 'Suvarnagram' must have indicated its ancient pre-Muslim antiquity. Cunningham is of opinion that although there are only a few fragments of Hindu work now left to attest the fact, it must have been the capital of Hindu principality anterior to the invasion of Muhammad bin Bakhtiyar Khalje'. In the words of Rennell `Sonargaon or Sunnergaum was a large city, and the provincial capital of the eastern division of Bengal before Dhaka was built. But it is dwindled to a village.' [১]

জনশ্রুতি আছে, 'মহারাজ জয়ধ্বজের সময় অত্র অঞ্চলে সুবর্ণবৃষ্টি হয়েছিল বলে এ স্থান সুবর্ণগ্রাম নামে পরিচিতি লাভ করে'।

তোফায়েল আহমদ 'আমাদের প্রাচীন শিল্প' গ্রন্থে জেমস্ টেইলর

এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'সোনারগাঁ অথবা সুবর্ণগ্রাম সম্ভবতঃ নামকরণ হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এখানে প্রচুর সোনা আমদানি হতো বলে।' তিনি আরো বলেন, 'অতীতে পূর্ববঙ্গে (Eastern Part of Bengal) আরাকান ও পেগু থেকে অনেক সোনা আসতো। উল্লিখিত দেশ থেকে জাহাজ যোগে চট্টগ্রাম আগমনকালে সিজার ফ্রেডরিকের (১৫৬৩) জাহাজ স্থির রাখার জন্য ভারী জিনিস (Ballast) ও নাবিকদের খাদ্য সামগ্রী ছাড়া সে জলযানে একমাত্র পণ্য বোঝাই করা হয় সোনা-রূপা। প্রাচীনকালে স্বর্ণই সোনারগাঁয়ের প্রধান আমদানি পণ্য ছিল।' হয়তোবা এ কারণে এখানকার নামকরণ করা হয় সুবর্ণগ্রাম নামে।

নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, 'প্রাচীন নিম্নবঙ্গে বা তার আশেপাশে সোনারখনি ছিল অথবা বুড়িগঙ্গা বা সুবর্ণগ্রামের পার্শ্ববর্তী নদীগুলোতে সোনার গুঁড়ো ভেসে আসতো এবং এ গুঁড়ো থেকে সুবর্ণ প্রাপ্তির ফলে সুবর্ণগ্রাম নামকরণ হ'তে পারে।'

কেউ কেউ বলেন, বার ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁর স্ত্রী সোনাবিবির নামানুসারে এর নাম হয়েছে সোনারগাঁ।

প্রারম্ভ কথা : সোনারগাঁ বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। সোনারগাঁ জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সোনারগাঁ মধ্যযুগে ছিল মুসলিম সুলতানদের রাজধানী। বর্তমানে সোনারগাঁ প্রাচ্যের ড্যান্ডিখ্যাত নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। জনশ্রুতি আছে, বৈদ্যেরবাজারের পূর্বনাম ছিল পাকিস্তানবাজার। এটি মেঘনা তীরবর্তী স্থানে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ বাজার ছিল। দূর-দুরান্ত থেকে জনগণ বৈদ্যেরবাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিমিত্তে আসতেন। একই সাথে নদী অববাহিকায় অবস্থান জনিত কারণে ওঝা-বৈদ্যরাও এ বাজারে আসতো এবং ধীরে ধীরে তারা এখানে বসতি স্থাপন করে। এই ওঝা-বৈদ্যরা বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে। তাদের হাজারো পসরা বিক্রয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পাকিস্তানবাজার একদা বৈদ্যেরবাজারে রূপান্তরিত হয়। প্রশাসনিক সুবিধার্থে এটিকে নারায়ণগঞ্জ থানা হতে পৃথক বৈদ্যেরবাজার থানা নাম করণ করে একটি থানা গঠন করা হয়। নদী ভাঙ্গনের ফলে এক পর্যায়ে বৈদ্যেরবাজার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ফলে বৈদ্যেরবাজার থানা স্থানান্তর অত্যন্ত জরুরি হয়ে পরে।

'১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ বৈদ্যেরবাজার থানা থেকে সোনারগাঁ থানা এবং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে থানা থেকে সোনারগাঁ উপজেলায় উন্নীত হয়। এর আয়তন ১৭১.০৫ বর্গ কিলোমিটার এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা সদর হতে এটি প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।'[২] মুঘল আমলে ২৪ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছিল এর অবস্থান। এখন এর পরিচিতি উপজেলা হিসেবে।

সুলতানি আমলে নির্মিত রাজস্ব আদায় ভবন, সোনারগাঁ

সোনারগাঁয়ের ইতিহাস জানার জন্য আমাদের প্রধানত পৌরাণিক উপাখ্যান, কিংবদন্তির উপরই বেশি নির্ভর করতে হয়। মধ্যযুগীয় এই নগরটির অবস্থান নির্ণয় করা দুষ্কর। সোনারগাঁয়ের পূর্বে মেঘনা নদী, দক্ষিণ-পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী এবং উত্তরে ব্রহ্মপুত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এলাকাটি খুব উন্নত ছিল। নদী অববাহিকায় অবস্থিত সোনারগাঁও অঞ্চলের জমি ছিল উর্বর। এখানে সেচ সুবিধা থাকায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। এখানকার অধিবাসিরা ধনাঢ্য ও সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। সংগত কারণেই রাজা-বাদশাহগণ সানন্দে সোনারগাঁয় বাংলার রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন।

এই সোনারগাঁয়ের ইতিহাস প্রাক-মুসলিম যুগ অথবা মুসলিম যুগ কোন সময় থেকে শুরু হয়েছে-এ বিষয়ে এখনো ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণীত হয়নি। সুলতান বলবনের সময়কাল ১২৬৫-১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ

ইতিহাসে সোনারগাঁয়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রায় সাতশত বছর আগে। কিন্তু সোনারগাঁও জনপদ সাতশত বছরের চেয়েও অনেক প্রাচীন। 'পৌরাণিক সূত্রমতে সোনারগাঁওকে তিন হাজার বছরের অধিক প্রাচীন জনপদ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সোনারগাঁয়ের পূর্ব নাম সুবর্ণগ্রাম। মসলিনের ক্রয়-বিক্রয় অতি প্রাচীনকাল হতে সুবর্ণগ্রামেই সম্পন্ন হতো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গের সুক্ষ্ম বস্ত্রের উল্লেখ আছে। এ সুক্ষ্মবস্ত্র নিঃসন্দেহে মসলিন। কারণ জেমস্ টেলর বলেছেন, ঢাকা অঞ্চলের (নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁওসহ) মতো উৎকৃষ্ট কার্পাস পৃথিবীর কোথাও উৎপন্ন হয় না। কাজেই কৌটিল্যের প্রসঙ্গ ধরে সোনারগাঁওকে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন জনপদ বলা যায়।' [৩] আমার এ লেখাটি মূলত বিচ্ছিন্ন সূত্র ধরে শুধু সোনারগাঁয়ের প্রাচীন অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়াস মাত্র।

ঐতিহাসিক স্বরূপচন্দ্র রায়ের মতে, 'সুবর্ণগ্রাম একটি প্রাচীন গ্রাম। বৌদ্ধ আমল থেকেই সুবর্ণগ্রাম শুর, পাল, দেব, প্রভৃতি রাজাদের রাজধানী হিসেবে মর্যাদা পেয়েছিল। সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ প্রাচীন বঙ্গের বিশেষ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।'[৪] সোনারগাঁয়ের প্রাচীনতা সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত সূত্রের দুঃসাধ্য যোজনার অভাবেই হয়তো কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। রমেশচন্দ্র মজুমদার History of Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, It has however, to be admitted that there is no dated reference to Sonargaon before the thirteenth century AD, অর্থাৎ 'ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে সোনারগাঁয়ের কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না।'[৫] অনুসন্ধানে সন তারিখের উল্লেখ পাওয়া না গেলেও প্রাচীন বঙ্গে সোনারগাঁয়ের নাম অবলোকন করা যায়।

ঐতিহাসিক V.A Smith The Early History of India, গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'Savarnabumi Golden Coast of the Chinese. Scoff connects the name with the Gangetic port of Sonargaon. সোনারগাঁয়ে প্রাক-মুসলিম পুরাকীর্তির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া না গেলেও এক সময় এ অঞ্চল শিল্প-সংস্কৃতির প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। চৌদ্দ শতকের প্রথমে দিল্লী সুলতানের প্রতিনিধি শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজ নামে সোনারগাঁ থেকে মুদ্রা প্রচারের পর ইতিহাসের পাথুরে পাতায় সুবর্ণগ্রামের নাম স্থান করে নেয়। সুবর্ণগ্রাম মূলত নদী তীরবর্তী একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল।

'আনুমানিক ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন তুঘরিল

খানকে দমনের উদ্দেশ্যে সোনারগাঁয়ে আগমন করেন । অতঃপর ক্ষমতাশীন রাজা রায় দনুজমর্দন দেব সন্ধিবদ্ধ হলে সোনারগাঁ দিল্লীর সুলতানদের আওতাধীন হয় । পরবর্তী কয়েক শতাব্দী সোনারগাঁ মুসলিম শাসকদের রাজধানী হিসেবে মর্যাদা লাভ করে ।'[৬]

'১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমল বলা হয়। এই সুলতানি আমল বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলার পূর্বাঞ্চল সোনারগাঁকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং এটি পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র রাজধানী হিসেবে প্রথম মর্যাদা লাভ করে। এরপর শামস্-আল-দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭), ইখতিয়ার-আল-দীন গাজী শাহ (১৩৪৯-১৩৫৩), সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-১৩৯১), গিয়াস-আল-দীন-আযম শাহ (১৩৯২-১৪১০), সাইফ-আল-দীন-হামযা শাহ (১৪১০-১৪১১), আলা-আল-দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) প্রমুখ ইলিয়াস শাহী এবং হোসেন শাহী সুলতানগণ বাংলার রাজধানী সোনারগাঁ থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বার ভূঁইয়া প্রধান মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের আমলে (১৫৬০) সোনারগাঁ বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে। উল্লেখ আছে এই সোনারগাঁয়ের পানাম শহরেই ছিল তাঁর প্রধান সামরিক পরিদপ্তর। আনুমানিক ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খান মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।'[৭] সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই সোনারগাঁও শহর অংশে দিল্লির সুলতান বলবনের আদেশে ১২৮২ সালে প্রসিদ্ধ মুসলিম ফকিহ শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা এসে 'জামেয়া' ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই জামেয়া তৎকালীন বিশ্বে খুবই প্রশংসিত ছিল। এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম ছাত্র ফিকাহ শাস্ত্র, হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য আসতেন। বিহারের মানের প্রদেশের ইয়াহইয়া মানেরী এখানে এসে জ্ঞান আহরণ করে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আবু তাওয়ামা সোনারগাঁওকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি করেছিলেন। তিনি ১৩০০ সালে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর সমাধি সোনারগাঁয়ে চিহ্নিত হয়। পরবর্তী সময়ে এ জামেয়ার স্বনামধন্য শিক্ষকগণ নিজেদের গুণে তা পরিচালনা করেন। পান্ডুয়ার আলাউল হক এ জামেয়ায় অধ্যাপনা করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ও আলাউলের পুত্র নূর কুতবে আলম ও খান আল আযম এখানে অধ্যয়ন করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সে যুগের বিখ্যাত সুফি, পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

এই সোনারগাঁয়ের মধ্যে দিয়েই নির্মিত হয় ষোড়শ শতকের দিল্লীর শাসক শের শাহের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড, যা সিন্ধু থেকে সোনারগাঁয় এসে শেষ হয়।

সোনারগাঁ শুধু প্রশাসনিক দিক দিয়েই নয় ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানেও প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। এখানকার প্রাচীন সমাধি, মসজিদ ও স্থাপত্য নিদর্শনই এর যথার্থ প্রমাণ বহন করে। মধ্যযুগে সমাজ তথা রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সোনারগাঁ বিদেশি খ্যাতনামা পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। মধ্যযুগে সোনারগাঁ ছিল একটি সমৃদ্ধশালী শহর।

'ইবনে বতুতা (১৩৪৫-১৩৪৬) সোনারগাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী রূপে বর্ণনা করেন। তিনি চীন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে সোনারগাঁয়ের সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন'। ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে 'সোনারগাঁয় ধান, আখ, সরিষা উৎপন্ন হতো। প্রচুর চাউল সোনারগাঁও বন্দর দিয়ে শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করা হতো। আখ জন্মাত প্রচুর পরিমাণে। আখ থেকে গুড় ও চিনি উৎপন্ন করা হতো ও রপ্তানি করা হতো।'

'চীনের পরিব্রাজক মাহুয়ান (১৪০৬) সোনারগাঁকে একটি বিরাট বাণিজ্যিক শহর হিসেবে দেখতে পান। ফাহিয়েন (১৪১৫) সোনারগাঁকে বহু পুকুর, পাকা সড়ক ও বাজার সমৃদ্ধ একটি সুরক্ষিত এলাকা এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্ররূপে উল্লেখ করেন। সেখানে সব ধরনের পণ্য সামগ্রী মজুদ ও বিক্রয় করা হতো।'

'পর্যটক ভারথেমা সোনারগাঁও বন্দরকে সমৃদ্ধিশালী বলেছেন। তাঁর মতে এ বন্দরের যত ধনী ব্যবসায়ী আছে এত আর কোনো বন্দরে তিনি দেখেননি। এ বন্দরে সোনা রূপার মুদ্রার পাশাপাশি কড়ি বিনিময়ের মাধ্যম ছিল। কড়ি সাধারণ লোকেরা ব্যবহার করত।'

ইংরেজ ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজক রালফ্ফিচ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন, 'সেকালে সোনারগাঁ থেকে বিপুল পরিমাণ তাঁতবস্ত্র (পৃথিবী বিখ্যাত মসলিন) এবং চাউল ভারত, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। সোনারগাঁ থেকে এক সময় জাভাদ্বীপের সাথে জলপথে বাণিজ্য চলতো।'

'১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খান 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি ধারণ করে সোনারগাঁয়ের জমিদারীতে অভিষিক্ত হন। তিনিও তাঁর পরাক্রমশালী পিতার মতো মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করতে বার ভূঁইয়াদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতেন। সে সময় সোনারগাঁ একটি সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যকেন্দ্র এবং কোলাহল মুখর গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে পরিণত হয়'। সোনারগাঁ ঈসা খান ও তাঁর পুত্র মুসা খানের রাজধানী শহর ছিল। এই অঞ্চল মুঘল অধিকারে যাওয়ায় এটি মসলিন বিক্রয়ের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সোনারগাঁও ধ্বংসাবশেষের স্থাপত্যচিহ্ন, সময়কাল : ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ

'এককালে সোনারগাঁও অঞ্চল ব্যবসায়-বাণিজ্যে সারাবিশ্বে বিখ্যাত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রসিদ্ধ জায়গা হিসেবে বিশেষ করে মসলিন কাপড়ের জন্য 'সোনারগাঁও' এবং সমুদ্রবন্দর জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য 'চট্টগ্রাম', এ দুটি জায়গার নাম সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সোনারগাঁও এবং এর আশেপাশে তৈরি মসলিন রপ্তানি হতো ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে। আমাদের এদেশ চিরকাল বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এ দেশের বাণিজ্যের খ্যাতিতে প্রলুব্ধ হয়ে আরবগণ স্মরণাতীতকাল থেকে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দলে দলে এ দেশে শুভাগমন করেন। বাণিজ্য বিষয়ে তখন এ অঞ্চলের শ্রী বৃদ্ধি এতদূর হয়েছিল যে ইতিহাসখ্যাত তাম্রলিপ্ত এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রামের সাথে এর ঘোর প্রতিযোগিতা চলতো। এ অঞ্চলের বাণিজ্য খ্যাতি প্রাচ্যের দেশ ছাড়িয়ে সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। খ্রিস্ট্রীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা এখানে এসে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেন। তারা সপ্তগ্রামকে Porto Piqueno বা ক্ষুদ্র বন্দর এবং চট্টগ্রামকে Porto Grando বা বৃহৎ বন্দর নামে অভিহিত করেন। উল্লেখ্য, বণিজ্য বন্দর হিসেবে পশ্চিম বঙ্গের সপ্তগ্রাম নামটিও বিখ্যাত ছিল। ভাগীরথী নদী ও সরস্বতী খালের

মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের সাথে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য চলতো। সমুদ্র পথে ব্যবসায়ের জন্যও আমাদের দেশ প্রসিদ্ধ ছিল। সমুদ্রগামী জাহাজও এদেশে নির্মিত হতো। চৈনিক পরিব্রাজক মাহুয়ান লিখেছেন যে, এদেশের জাহাজ নির্মাণ প্রণালির শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করে রোমের মহামান্য সম্রাট আলেকজান্ড্রিয়ার ডক কারখানা ও জাহাজ পছন্দ না করে চট্টগ্রাম থেকে জাহাজ তৈরি করে নিতেন। চট্টগ্রামের হালি শহর পতেঙ্গায় দেশীয় শিল্পীর কর্তৃত্বে অনেকগুলো জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। ঐ সকল কারখানায় তখন হাতুড়ির ঠক্‌ঠক্ শব্দে সবসময় মুখরিত থাকতো। এদেশের সওদাগরেরা তখন শতাধিক জাহাজের মালিক ছিলেন। ইতিহাসবিদ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের মতে ঐ সকল জাহাজ নির্মাণ কারখানা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিজেদের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল।'[৮] যাহোক মুঘল সুবেদার ইসলাম খানের সময়ে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরনগরে / ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে সোনারগাঁয়ের গুরুত্ব ম্লান হয়ে যায়। রাজধানী স্থানান্তরের অন্যতম কারণ ছিল নদী রেখার পরিবর্তন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সুবর্ণগ্রাম জঙ্গলে পরিব্যপ্ত অঞ্চলে পরিণত হয়। এর উপকণ্ঠে পরিত্যক্ত জঙ্গলাবৃত অঞ্চলের সামান্য অংশে ধীরে ধীরে একদা গড়ে ওঠে পানাম সিটি।

পানাম সিটি

এখানে সুলতানি, মুঘল, ব্রিটিশ ও উপনিবেশিক সভ্যতার স্থাপত্য নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে বেশ কিছু সনাতন ধর্মীয় ব্যবসায়ীর ভগ্নপ্রায় জমকালো ঘরবাড়ি আজও বিস্ময় জাগায়। একদা সোনারগাঁয়ের খাসনগর দিঘির পাড়ে ভূবন বিখ্যাত মসলিন তৈরি হতো। এরই ধারাবাহিকতায় এখন সোনারগাঁয় তৈরি হয় আশাজাগানিয়া জামদানি। এখানকার পানাম সিটি এক সময়ে সোনারগাঁয়ের প্রধানতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। তখন থেকে পানাম সিটি সোনারগাঁয়ের উল্লেখযোগ্য এবং অতীতের সমৃদ্ধশালী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এটি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত দুর্গের মতো ছিল।

এই পানামসিটি সোনারগাঁয়ের সমৃদ্ধশালী প্রাচীন জনপদ। পানামের ইতিহাস কত প্রাচীন এ-সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। পানামের অবস্থান, বাসস্থান, শানবাঁধানো ঘাট, পুকুর, দিঘি, ইমারতরাজি, মসজিদ, মন্দির, মঠ, পরিখা, ভৌগোলিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা অবলোকনে ধারণা করা হয় আলোচিত অঞ্চলের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো।

নদী বিধৌত প্রাকৃতিক উর্বর পললভূমির কারণে ঐতিহাসিক সোনারগাঁও অঞ্চল কৃষি পণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এছাড়া অভ্যন্তরীণ ও বার্হিবাণিজ্যের কারণেও এ-অঞ্চলের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি স্থান সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। ড. নীহারঞ্জন রায়ের মতে, "গুপ্ত, পাল, সেনযুগে সুবর্ণগ্রাম 'বিজয়স্কন্ধাভার' হিসেবে চিহ্নিত ছিল। গুপ্তদের সময়ে তমলুক (তাম্রলিপ্ত) বন্দর ঐশ্বর্যশালী সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে পরিচিতি পায়। সে সময় অভ্যন্তরীণ ও নৌবন্দর হিসেবে সুর্বণগ্রামের অবস্থানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তিব্বতের ইতিহাস 'প্যাগস্যাম জ্যাংজং' এ-এর উল্লেখ আছে"। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ও বৌদ্ধ ধর্মবিশারদ উয়াংচোয়াং পৌণ্ড্রবর্ধন এবং সুবর্ণগ্রামের আশপাশের বৌদ্ধ বিহারের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কালিকাপুরাণে লাঙ্গলবন্ধ এবং মহাভারতের পঞ্চমীঘাটে পাণ্ডবদের যাতায়াত ছিল বলে জানা যায়। হিন্দুপুরাণের ভাষ্যমতে, "ব্রহ্মপুত্রের দু'তীরে সুবর্ণগ্রামের অবস্থিতি। এখানে কিরাত নিষাদদের আবাসভূমি ছিল এবং এ গোষ্ঠী স্বর্ণবিভূষিত জাতি ছিল"। রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের শ্লোকেই উল্লেখ দেখা যায়। লোহিত্যাপূর্ব্বতে বঙ্গঃ/বঙ্গে স্বর্ণ গ্রামাদয়ঃ। এছাড়া ঐতিহাসিক স্বরূপচন্দ্র রায় সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন স্বর্ণভূষিত জাতির দেশই ঢাকার নিকটবর্তী সুবর্ণগ্রাম, স্বর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও।

আলোচিত পানামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রামাণিক তথ্যের অভাবে পানাম সিটির ইতিহাসকে গ্রন্থবদ্ধ করা যায়নি। তবে প্রাচীন রাজধানীর শেষ স্মৃতিচিহ্ন অনিন্দ্যসুন্দর পানাম সিটি। পানামসিটির ভগ্নপ্রায় ইমারতরাজি এখনো অতীত ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয়। পানাম অঞ্চলের জনমানুষের জীবনযাত্রার পাশাপাশি সমৃদ্ধশালী শহর গড়ে ওঠা বিস্ময়ের ব্যাপার। পানামসিটিকে কেন্দ্র করে যে নগরায়ন ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা একটি দক্ষ ও পরিশীলিত সামাজিক অবকাঠামো ছিল। এর মূল চালিকাশক্তি ছিল কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক সুদৃঢ় ব্যবস্থা। পানাম শিল্প ও শিল্পীদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বিপণন কেন্দ্র ছিল। এটিকে ঘিরে একটি সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

পানাম সিটির ইমারতগুলোকে তিনটি টাইপে ভাগ করা যায় :

সেন্ট্রাল হল টাইপ : যে ইমারতের হল রুমগুলো ডাবল হাইট মূল

ফোকাস, প্লান লেআউটে নির্মিত সেগুলো সেন্ট্রাল হল টাইপ ইমারত। সেন্ট্রাল হল টাইপ ২৬ নম্বার ইমারত।

সেন্ট্রাল কোর্টইয়ার্ড টাইপ : পানাম সিটির যে ইমারতগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত সেন্ট্রাল কোর্টইয়ার্ড আছে, সেগুলো সেন্ট্রাল কোর্টইয়ার্ড টাইপ ইমারত। সেন্ট্রাল কোর্টইয়ার্ড যে সব সময় সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রে ছিল এমন না। সেন্ট্রাল কোর্টইয়ার্ড টাইপ ৪০ নম্বর ইমারত।

কন্সোলিডেটেড টাইপ : পানাম সিটির সে ইমারতগুলোতে কোন অভ্যন্তরীণ হল রুম বা কোর্টইয়ার্ড নেই সেগুলো কন্সোলিডেটেড টাইপ ইমারত। উদারহণ স্বরূপ বলা যায় আলোচিত সিটির ২২ নম্বর ইমারত কন্সোলিডেটেড টাইপ।

মুঘল ও ব্রিটিশ আমলে পানাম সিটিতে নির্মিত ইমারতের অনন্য স্থাপত্যশৈলী

ড. এস.এম তাইফুর এর মতে, "এক সময় পানামসিটিকে ঘিরে সুলতানি শাসনামল ও মুঘল পর্বের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছিল"। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়, "সরকার সোনারগাঁও মুঘল আমলে ৫৮টি মহালে বিভক্ত ছিল। সে সময় বাংলা ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। এর অন্যতম একটি সরকারি বিভাগ সরকার সোনারগাঁও। সম্রাটকে রাজস্ব প্রদান করত সোনারগাঁও ৪,৫৯,৫৩২ দাম, খিজিরপুর ৪০,৩০৮ দাম, সরকার সোনারগাঁওকে সরকারের রাজস্ব পরিশোধ করতে হতো ২,৫৮,২৮৩ সিক্কা টাকায় বলে ধারণা করা হয়। মুঘল আমলে পানামসিটি এবং মোগরাপাড়ায় রাজস্বের অর্থ নির্ধারিত ছিল

৪,৫৯,৫৩২ দাম। এখানে খিজিরপুরের রাজস্বের পরিমাণ সোনারগাঁয়ের চেয়ে অনেক কম মাত্র ৪০,৩০৮ দাম"। তবে সোনারগাঁও বলতে আমিনপুর, পানাম, দুলালপুর ও মোগরাপাড়াকে বুঝাত।

পানামসিটির তিনটি স্তর রয়েছে। পানাম নগরীর উত্তরাংশে (পঙ্খিরাজ খালের উত্তরে) আমিনপুর অংশ বেশি প্রাচীন বলে মনে হয়। এখানে সুলতানি, মুঘল স্থাপনা টাকশাল বাড়ি, ক্রোড়িবাড়ি-দিঘি, মঠবাড়ি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠি, প্রাচীন বাড়িঘরগুলোর স্মৃতিচিহ্ন বিরাজমান। প্রাচীন 'হাবেলী সোনারগাঁও' সমসাময়িক পানামসিটির দক্ষিণাংশ 'বাগ-ই-মুছা, অনন্তমুছা, ঈসা পাড়া' খান জাহান মৌজা' দৈলুরবাগ' গ্রামগুলোতে মুঘল আমলের কয়েকটি স্থাপনা, দিঘি, মুসা খাঁর বাড়ি, বাগ-ই-মুছা, ঈশাখাঁর কথিত বাড়ি ঈসাপাড়া, মুসাখাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনন্তমুছা, রণভাওয়াল মৌজা, দৈলুরবাগ, ছোট সরদারবাড়ি সবই সুলতানি আমল এবং মুঘল আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ঈসাপাড়া গ্রাম মসলিন স্মৃতিবিজড়িত 'খাসনগর দিঘি'র সাথে সম্পৃক্ত। মসলিনের উৎস সন্ধানে যেতে হলে অনুসন্ধিৎসু গবেষণায় যেতে হবে। পঙ্খিরাজ খালের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে পানামসিটি। আদমপুর রাস্তার শেষ প্রান্ত পূর্বদিকের মুঘল আমলের সেতু (সেতুটি ধ্বংস হয়ে গেছে) অতিক্রম করে প্রায় অর্ধ কিলোমিটারব্যাপী পোদ্দারবাড়ি পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি, এই শহরের মাঝে তিনটি শানবাঁধানো পুকুরের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। মূলত পানামসিটি সুলতানি আমল, মুঘল আমল ও পরবর্তীকালে মুঘল স্থাপনার উপরে সংস্কার করে ভবন সম্প্রসারিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। এই ইমারতগুলোর বড় অংশ সংস্কার করে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ স্থাপত্যের অনুকরণে তোরণ এবং পেছনের অংশের রূপ দেওয়া হয়েছে। পানাম নগরীর তোরণের লাগোয়া দক্ষিণাংশের দুটি ত্রিতল ভবনের তোরণে যে সন-তারিখ লেখা রয়েছে। এ-বাংলা সনের তারিখ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইমারত কয়েকটির নির্মাণকাল ১২০২ বাংলা। এই তারিখ অনুযায়ী ইমারতগুলোর বয়স ১৮৫০ থেকে ইতোমধ্যে প্রায় দুশো পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। ধারণা করা হয় ইমারতগুলো নির্মিত হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলের প্রথম দিকে।

তবে প্রাচীন সুলতানি এবং মুঘল আমলের ইমারত সংস্কার করে ঐ ভবনগুলোকে ব্রিটিশ স্থাপত্যের রূপ দেয়া হয়েছে। কারণ 'পানামসিটির' সম্মুখে (উত্তর দিকে) সুলতানি আমলের যে মনোরম স্থাপত্যশৈলীর ভগ্ন

ইমরাত দুটি ছিল (বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত)। সেগুলো দেখে অনেকেই এটিকে সুলতানি আমলের ইমারত বলে ধারণা করে থাকেন। সুলতানি ও মুঘল আমলে সোনারগাঁয়ে বস্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতির কারণে 'পানামসিটি' হয়ে ওঠে মসলিন ক্রয়-বিক্রয়ের বড় আড়ং।

এছাড়া শের শাহের আমলে পরগনার হেড কোয়ার্টার হিসেবে 'আমিনপুর, পরবর্তীকালে মুঘলদের সময়ে 'সরকার সোনারগাঁয়ের' প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'পানামসিটি'। ধারণা করা হয়, ঈশা খাঁর (১৫৭৭-১৫৯৯) রাজত্বকালে 'পানামসিটি' এবং তার আশপাশে সামরিক ইউনিটের একটি শক্ত ঘাঁটি আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। সামরিক গ্যারিসনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ঈশা খাঁর সময়ে থেকেই পানাম নামটি পরিচিত হয়। প্রশাসন, সরকারি কর্মকর্তা, রাজস্ব দপ্তরের প্রয়োজনে আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে বিদেশি বণিকরাও পানামসিটিতে এসে বাসভবন নির্মাণ করেন।

পানাম সিটির মধ্যভাগে তৈরি রাস্তার দৃশ্য

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে পানামের স্থাপত্যকলায় তিনটি কালের রূপান্তরের ধারা প্রকাশ পায়। প্রথমত সুলতানি আমলের স্থাপনার ওপরে মুঘল। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ স্থাপত্যের নমুনা দেখা যায়। মুঘল এবং ইংরেজ আমলের ইমারতের তোরণ ও নকশার মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ইসলামি স্থাপত্যের ধারা অনুযায়ী সুলতানি এবং মুঘল আমলের প্রাসাদগুলো নির্মিত হয়। সতেরশ শতকে পানামের

তোরণে অলঙ্কৃত পদ্মফুল ও ফুলদানি নকশা দেখা যায়। এসব ইমাতের তোরণের খিলান হুবহু মেলে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মোগরাপাড়ার দরগাবাড়ির চৌচালা স্থাপত্যের খিলানের পদ্মগুচ্ছের ফুলদানির অলঙ্করণের সাথে। মুঘল আমলের স্থাপত্য ইমারতে সরু সিঁড়ি, মাঝারি আকারের কার্নিশ ও বারান্দা দেখা যায়। মুঘল আমলে ঝুলন্ত ছাদ, পুরু দেয়াল, ছোট গবাক্ষ ছিল এসব ইমারতের বৈশিষ্ট্য। কখনো ইমারতের ছাদে শনে ছাওয়া কুঁড়েঘর সাদৃশ্য ইমারতও দৃষ্টিগোচর হয়। পানামের দু'টো ইমারতের শীর্ষে এখনো বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যকলার প্রতীক কুঁড়েঘর দেখা যায়। পানাম দুলালপুরে কোম্পানি কুঠি ও নীলকুঠির দ্বিতলেও চুন-সুরকি নির্মিত শনে ছাওয়া কুঁড়েঘরসাদৃশ্য ইমারত ছিল। অনেকের ধারণা এসব কুঁড়েঘর সাদৃশ্য ইমারত 'পুজোর ঘর' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ঐতিহাসিক ক্রোড়িবাড়িতে তেমনই 'কুঁড়েঘর' স্থাপত্য লক্ষ করা যায়। 'ক্রোড়িবাড়ির' স্থাপত্যকলার সাথে 'মোগরাপাড়া'র সাদৃশ্য পাওয়া যায়। পানামসিটির ইমারতরাজিতে কার্নিশের কাজ, ঈগলপাখির অলঙ্কৃত পাখির মূর্তিও লক্ষণীয়। আবার কার্নিশ তোরণ, খিলান, প্রবেশমুখের ওপরে ফুল-লতাপাতা অলঙ্কৃত। এর সাথে লতানো ফুলের বিন্যাসও অবলোকন করা যায়। তবে এটি চারশ বছরের প্রাচীন ইমারত চুন-সুরকি দ্বারা নির্মিত নির্মিত বলে ধারণা করা হয়।

তৎকালীন সময়ে ছাদে কাঠ ও লোহার বিমের প্রচলন ছিল না বলেই হয়তো চুন-সুরকি দিয়ে ইমারতগুলো নির্মিত হতো। কিছু ইমারতের ভেতরের অংশে কাঠ, লোহার বিম ব্যতীত ঝুলন্ত ছাদ, ভেতরের অংশ পেরিয়ে বাইরের অংশে কাঠের বিম এবং লোহার বিমের ছাদ লক্ষ করা যায়। এখানে মুঘল ঘরানার সাথে ঔপনিবেশিক সংমিশ্রণে কাকতালীয়ভাবে একটি নতুন ধারার স্থাপত্যিক বিন্যাস ঘটেছে।

রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর 'সোনারগাঁও' থেকে মুসলিম জমিদারগণ ঢাকায় তাদের নতুন বাসস্থান গড়ে তোলেন। এজন্য পুরনো ঢাকার অনেকে রাস্তার নাম সোনারগাঁয়ের মুসলিম জমিদারদের নামে দেখা যায়। উল্লিখিত কারণে মুসলিম জমিদারদের পরিত্যক্ত বাসভবন 'পানামসিটির' নব্য হিন্দু জমিদাদের অধিনস্থ হয়। এসব প্রাচীন বাড়িঘর সংস্কার করেই পানামে নতুন শহর গড়ে ওঠে। হিন্দু এলিট শ্রেণির ইমারত নির্মাণে স্বাভাবতই ঔপনিবেশিক স্থাপত্যকলার ছাপ ফুটে ওঠে। এক সময় পানামসিটিতে পূজা-অর্চনার জন্যে পূজামণ্ডপ, ঘর, মন্দির,

দেব-দেবীর মূর্তি এবং রাস্তা শ্রীবর্ধনের জন্যে ঢেউ খেলানো তোরণ নির্মিত হয়। তোরণের অগ্রভাবে বিভিন্ন ধাতব পদার্থ ইট-সুরকি দ্বারা নির্মিত উর্বশী, হাতে মশাল অথবা বাতিদানের ভাস্কর্য এখানে মূর্ত হয়ে ওঠে।

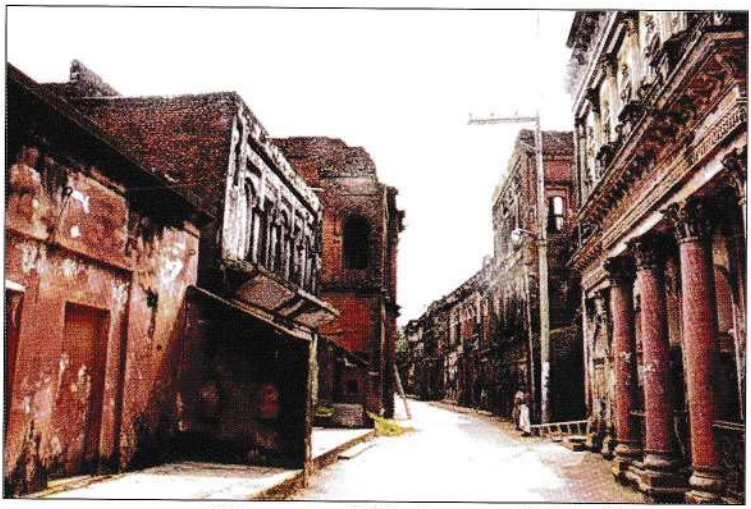

মুঘল ও ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ইমারতের নির্মাণশৈলী

১৯৮০ সালের দিকে পানামের রাজপথের তোরণের অগ্রভাগে উড়ন্ত উর্বশীর ভাস্কর্য দেখা যেত, বর্তমানে তা নেই। নগর প্রতিরক্ষার জন্যে নগরের সেতুর মুখে (বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত) লোহার গেইট ছিল। পানামসিটির পূর্বপাশে একটি এবং দক্ষিণ দিকে বাগ-ই-মুসা গ্রামের প্রবেশমুখে রাতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকের গেইট বন্ধ করে দেয়া হতো। পানামসিটির শেষ প্রান্তে একটি গম্বুজাকৃতির ইমারত ছিল। যা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার হিসেবে পরিগণিত হতো। পানামসিটির পয়োঃপ্রণালীর ব্যবস্থা হিসেবে এখনো ড্রেনেজ ব্যবস্থা দেখ যায়। পানামসিটির সারিবদ্ধ ইমারতের পেছনের দিকে কিছু ক্ষুদ্রকায় ইমারতেরও অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবত এসব ইমারত ভৃত্য, ঠাকুর, বামুন, পাচকদের আবাস ছিল। এখানে সুপেয় পানি প্রাপ্তির জন্যে ইঁদারা-কুয়োর বন্দোবস্ত ছিল। স্নান অথবা সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের জন্য পানামসিটির ভেতরে তিনটি পুকুরের পানি ব্যবহৃত হতো।

ব্রিটিশ স্থাপত্যিক মডেলে নির্মিত এসব ইমারতের সম্মুখভাগের সৌন্দর্যবর্ধনে ফুল-লতাপাতার ডিজাইন সম্বলিত ইস্পাত এবং লোহার

গ্রিল বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো বিলুপ্তির দারপ্রান্তে উপনীত হলেও ইমারতের সামনে ঢালাই ইস্পাত ও লোহার গ্রিলের ভেতরে দৃষ্টিনন্দন ফুলের বাগান ছিল। এখানকার ইমারতের বারান্দার পিলার নির্মিত হয়েছিল ইস্পাত এবং লোহা দিয়ে। অনেক ভবনের বারান্দায় ষোলঘুঁটি ও লুডু খেলার ছক ছিল। বৈকালিক আসরে বাড়ির অন্তঃপুরবাসিনীরা এ খেলার আনন্দে মগ্ন থাকত। সুরম্য দ্বিতল বাড়িগুলোর একতলার মাঝখানে জমকালো জলসা ঘর ছিল। এসব জলসা ঘরে সুরম্য নাটঘর, পূজোঘর বা মনোমুগ্ধকর ও দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যিক বিন্যাসে অলংকৃত হয়েছিল।

পূজোর ঘর বা জলসা ঘরের চারদিক ঘিরে চতুষ্কোণ আকৃতির বারান্দায় ফুল, লতাপাতা, ফুলের সাজির টেরাকোটা চিত্র, মনোমুগ্ধকর ফুটন্ত ফুল, লতানো ফুলের পাপড়ি সম্বলিত পেইন্টিং ছিল। দু-একটি ইমারতের জলসা ঘরের ভেতরের দেয়ালের কার্নিশে হিন্দু দেবী লক্ষ্মী-সরস্বতীর ছোট ছোট ম্যুরাল লক্ষ করা যায়। এ সব ইমারতের বাসিন্দাদের যথেষ্ট শানশওকত ছিল। এগুলোতে খুব আড়ম্বরপূর্ণ পূজা উৎসব পালিত হতো।

১৯৪৭ সালের পূর্বেও পানামসিটিতে ঘটা করে 'ঝুলন পূজা' সম্পন্ন হতো। বর্ণাঢ্য ঝুলন পূজা দেখার জন্যে দূর-দুরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসতেন। দুর্গাপূজাও ঘটা করে পালন করা হতো। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পূর্বে পানামসিটিতে জমজমাট অবস্থা বিদ্যমান ছিল। স্থানীয় প্রবীণরা বলেন, পানামসিটিতে সন্ধ্যায় তামা-কাঁসার ঝনঝনানি এবং সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোকমালায় সজ্জিত করা হতো ।

পানামের এলিট সম্প্রদায়ের ইতিহাস এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। শিক্ষা-দীক্ষা প্রসারের জন্যে ১৯০০ সালে পানামে প্রতিষ্ঠিত হয় সোনারগাঁ জি.আর. ইনস্টিটিউশন। এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটর ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী। ড. ভট্টশালী ১৯৩০ সালে এই স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

পানামের পোদ্দারবাড়ির নারায়ণ পোদ্দার নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন। এই আনন্দ পোদ্দারই সোনারগাঁয়ের আনন্দবাজার হাটের স্রষ্টা। সোনারগাঁ জি.আর. ইন্সটিটিউশনের অনেক কৃতী ছাত্র ভারতে পরবর্তীকালে প্রশাসনিক

ক্ষেত্রে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। লোক মুখে শোনা যায়, এখানে বাঈজিদের নাচ-গানেরও আয়োজন করতেন ধনাঢ্য লোকেরা। মোটা অর্থের বিনিময়ে কোলকতার নামকরা বাঈজি ও গায়কদের এখানে আমন্ত্রণ করা হতো। তবে ইংরেজ সিভিলিয়ান জেমস্ টেলর ১৮৪০ সালে যখন পানামসিটিতে এসেছিলেন, পানামের পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁর কাছে ভালো লাগেনি। টেলরের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, বিশ্বখ্যাত বস্ত্রশিল্প তখন বিলুপ্তির দিকে। অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব পড়েছিল পানামে। যেখানে দালালপুর (মসলিনের কারিগর ও দালালদের বাসস্থান, বর্তমানে পানাম দুলালপুর) গ্রামে তেরো-চৌদ্দশত মসলিন তাঁতির অস্তিত্ব ছিল। সেখানে নীলকুঠিতে মাত্র তিনশত মসলিন কারিগরের নাম লিপিবদ্ধ দেখেছিলেন টেলর। মসলিনের সমৃদ্ধির সময় পানামে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকদের আনাগোনা ছিল। সম্ভবত পর্তুগিজ, ডাচ, ওলন্দাজ, গ্রিক, আর্মেনিয়ান, রোমানদের বাণিজ্যের জন্য পানামে আসা-যাওয়া ছিল।

পানামসিটির কয়েকটি ইমারতের তোরণে গ্রিক-রোমান স্থাপত্যকলার ধরণ লক্ষ করা যায়। বাণিজ্যের কারণে বিদেশি বণিকেরা হয়তো এখানে স্থায়ী আবাসও গড়ে তুলেছিলেন। ঢাকাই মসলিনের বাণিজ্যের আর্মেনীয় ও গ্রিকরা যেমন ঢাকার আরমানিটোলা গড়ে তুলেছিল। একইভাবে ইউরোপীয় বণিকরা হয়তো কোম্পানি আমলের পূর্বে মুঘল আমলে এখানে বসতি স্থাপন করে। যদিও পাশ্চাত্যের কোনো বণিক-সওদাগরের নাম এখানকার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই। অনুসন্ধানে জানা যায়, মসলিন ব্যবসার সুবর্ণ যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বণিক-সওদাগরদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল পানাম সোনারগাঁও। নবাব মুর্শিদ কুলি খান দিল্লির সম্রাটদের জন্যে প্রতি বছর মহামূল্যবান মসলিন কাপড় পাঠাতেন। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময়ে পানামের কয়েকটি ইমারতে দুর্বৃত্তরা মসলিন কাপড় লুট করেছিল। দাঙ্গাবাজরা গুরুত্ব না বুঝে এসব মহামূল্যবান মসলিন ধ্বংস করে ফেলেছিল।

এক সময়ে সূক্ষ্ম নকশি খাট-পালঙ্ক, গোল টেবিল, কুড়ানি, খড়ম, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি এমনকি কাঠের সিঁড়িতেও সোনারগাঁয়ের কারুশিল্পীদের চমৎকার কাজ লক্ষ করা যায়। তবে সুরম্য অট্টালিকাতে বিশেষ করে তোরণদ্বারে ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি, পোদ্দারবাড়ি,

পানামসিটির জলসা ঘর রঙিন চীনা মাটির পাত্রের খণ্ডাংশ চিন্নিটিকরি নকশা ব্যবহৃত হয়েছিল। রঙিন চীনামাটির টাইলসগুলো ফুল, ফুলের টব এবং লতাপাতায় পরিকল্পিতভাবে সুবিন্যস্ত ছিল। এগুলোর নান্দনিক দৃশ্য অপরূপ হয়ে ফুটে উঠত বৈকালিক সূর্যের আলোয় এবং পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভবনের সামনে এবং পিছনে পুকুরের অস্তিত্ব ছিল। পুকুরগুলোতে শানবাঁধানো ঘাট ছিল। এর চারদিকে বকুল, কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ এবং দেশি ফলের গাছ ছিল। এখানে সারিবদ্ধ ইমারত নির্মাণে যে ইটের প্রয়োজন হতো, তা নিজেদের তত্ত্বাবধানে ইটের ভাটায় তৈরি করা হতো। প্রবীণদের কাছে জানা যায়, ব্রিটিশ যুগে ধনিক শ্রেণির সাথে কোলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। কোলকাতাকেন্দ্রিক বাবুরা এখানে প্রতিষ্ঠিত হবার পাশাপাশি কোলকাতায়ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করেছিলেন। অনেকের মন্তব্য, ঔপনিবেশিক শাসনামলে কোলকাতার আদলে পানামের বাবুরা তাদের ভবনে স্থাপত্যশৈলীর প্রকাশ ঘটিয়েছিল।

ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ইমারতের স্থাপত্যশৈলী

পানামসিটির অভিজাত শ্রেণির লোকেরা কোলকাতায় শিক্ষা গ্রহণ করত। সে সময়ে সোনারগাঁও থেকে কোলকাতা যাওয়ার প্রধান মাধ্যম ছিল স্টিমার। বারদীর ছটারিয়া মেঘনাতীরবর্তী স্থানটি ছিল প্রধান

স্টিমার বন্দর। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের আগেই পানামের বাবুদের পরিবারের সদস্যরা কোলকাতায় স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলে। দেশবিভাগের পর নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দুরা পানামসিটিতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। অতঃপর ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ ভারতে চলে যায়।

মুঘল ও ব্রিটিশ আমলে নির্মিত ইমারতের স্থাপত্যশৈলী

কোম্পানি আমলের শেষ পর্বে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পানামের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঝে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। প্রবীণ লোকেরা বলেন, পানামের শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের অনেক তরুণ স্বদেশি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে অভিজাত শ্রেণির তরুণ-তরুণীরা উচ্চশিক্ষার জন্যে ভারতে, বিশেষত কোলকাতা চলে যান। ১৯৪৭ সাল এবং পরবর্তীকালে ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ ঐতিহাসিক পানামসিটির জৌলুস ম্লান হয়ে যায়। (পানামসিটির কিছু তথ্য শামসুদ্দোহা চৌধুরী রচিত প্রাচীন নগরী সোনাগাঁও থেকে নেয়া)

সময়ের পালা বদলে প্রারম্ভিক প্রাচীন রাজধানী শহর সোনারগাঁয়ে এসেছে অনেক পরিবর্তন। দ্রুত নগরায়নের ফলে বদলে গেছে এখানকার পুরোনো চেহারা। ইতিহাস ঐতিহ্যে ঋদ্ধিমান সোনারগাঁয় রয়েছে অনেক দর্শনীয় নিদর্শন।

ড. হাবিবা খাতুন 'ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের নিরিখে সোনারগাঁ ও ঈসা খাঁর পরিচিতি' শীর্ষক এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন,'পানাম নামের কোনো অর্থ পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি পানাম শব্দের ফার্সি উৎস সম্পর্কে জানা গেছে যে, এর অর্থ আশ্রয়স্থল হতে পারে। ঈসা খাঁ মুঘলদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সোনারগাঁয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্থানটি নিশ্চয়ই অধিকতর সুরক্ষিত ছিল। তিনি সোনারগাঁও থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর এ আশ্রয়স্থল পানাম হতে পারে। স্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ও প্রাকৃতিক জলাধার দিয়ে সুরক্ষিত দুর্গের মত। সোনারগাঁও শহরের এ অংশ তার অধিকার ভূক্ত এলাকা ছিল। ইতিহাসে সোনারগাঁও-এ ঈসা খাঁর আশ্রয়স্থল নির্দিষ্ট করা হয়নি।'[৯]

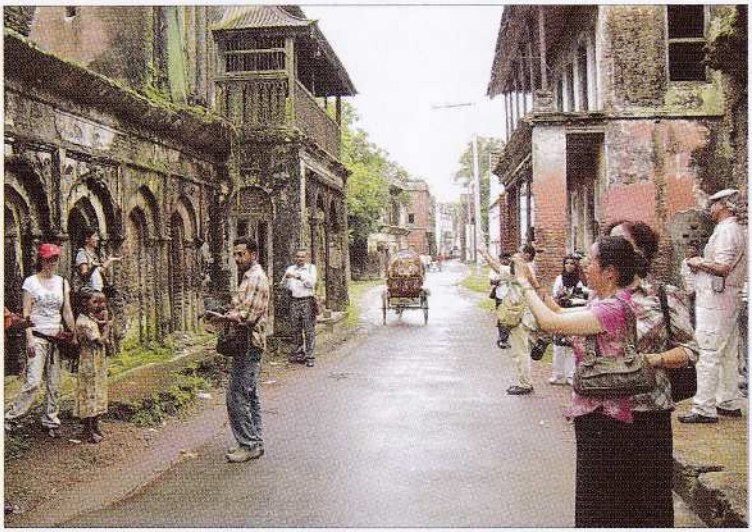

পানাম সিটি পরির্দশনে বিদেশি পর্যটক

পানাম সিটির চারদিকে পরিখার মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছিল লাল ইটের ইমারত। পুরাতন ছোট ছোট ইট-সংযোগে তৈরি এ ইমারতগুলো প্রাচীনকালের গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রিটিশ সময়কালে ইংরেজরা এখানে নির্মাণ করেছিল নীলকুঠি, যা আজও 'কোম্পানি কুঠি' নামে পরিচিত। জমিদার এবং ব্যবসায়ীরা এখানে রাস্তার দু'ধারে আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ করেছিলেন। এখানে মুঘল আর ব্রিটিশ শৈলী মিলে মিশে একাকার। কোথাও হাত মিলিয়েছে ভারতীয় আর ব্রিটিশ স্থাপত্য। কোথাও চোখে পরে সুক্ষ্ম পাথরের কারুকাজ।

আনুমানিক ৫ মিটার প্রশস্ত রাস্তার দু'পাশ ঘিরে গড়ে ওঠে এই ঐতিহাসিক পানাম সিটি। এটি একটি একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়নাভিরাম সিটি। বর্তমানে রাস্তার উত্তর পাশে ৩১টি এবং দক্ষিণ পাশে ২১টি ইমারতসহ মোট ৫২টি ইমারত রয়েছে। ইউরোপীয় স্থাপত্যের অনুকরণে রূপায়িত হয় পানাম সিটির ইমারতগুলোর অলঙ্করণ নকশা। কোথাও কোথাও স্থানীয় নকশাও ব্যবহৃত হয়।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ড. শফিকুল আলম বলেন, 'বর্তমানে পানাম সিটির প্রাচীন স্থাপত্য অবকাঠামো সংস্কার সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। পানাম সিটির সুরম্য ভবনগুলো ও এর পরিবেশ সংরক্ষণ করে একটি আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত করার উদ্দেশে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মুঘল ও ব্রিটিশ সময়ে নির্মিত এই পানাম সিটিতে যে সব হর্মরাজি, বাসভবন, নাচঘর, মঠ, টাকশাল, পুকুরঘাট, গোসলখানা, দরবার হল, ব্রিজ, নীহারিকা, রেস্ট হাউস কালোত্তীর্ণ হয়ে প্রকৃতি– পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে আছে সেগুলো যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।'

এসএম তাইফুরের মতে, 'Traces of old fortification and moats could still be found there . It is presumed that at one time this place contained the actual seat of the rulers of Sonargaon. অর্থাৎ 'প্রাচীন দুর্গ ও পরিখার নিদর্শন এখনো সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, এ এলাকাটিই এক সময়ে সোনারগাঁয়ের শাসকদের মূল রাজধানী ছিল।' James Tayler Topography and statistice of Dacca গ্রন্থে লিখেছেন, পানামই ছিল, তখনকার মুসলমান রাজধানী, যাকে তাঁরা 'হাবেলী সোনারগাঁ' বলেও অভিহিত করতেন। Panam is the ancient city of Sonargaon, The Havellee Sonargaon of the part of the country. It is situated about two miles inland from the Brahmaputra Creek. তাছাড়া এখানে এক সময়ে ছিল ট্রেজারার হাউস, অস্ত্রাগার, নীহারিকা, রেস্ট হাউসসহ স্মৃতি বিজড়িত অনেক ইমারত। এই ইমারতগুলো রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে নির্মিত এবং দেশের শহর এলাকার বাড়ির অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের সবগুলো ইমারতের সম্মুখভাগ রাস্তার দিকে অবলোকন করা যায়। চুন-সুরকির গাঁথুনি দিয়ে এই ইমারতগুলো নিপুণভাবে নির্মাণ করা হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'Sonargaon-Panam' গ্রন্থে এসব ইমারতের সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে, 'The present building of Panam Nagar can at best be dated back to the late 18th or early 19th century. So it is very like that the colonial period structures grew up on the site an earlier occupation of the Muslim period. Only archaeological excavations in the area can either prove or disprove this hypothesis.'[১০] অতীত ঐতিহ্য সংবলিত এ সিটির গৌরবময় দিনের নিদর্শন না থাকলেও ভগ্নপ্রায় ইমারতগুলো যে কোনো ঐতিহ্যপ্রেমী মানুষের কাছেই মূল্যবান। এই পানাম সিটির একটি সরকারি রিকুইজিশনকৃত পুরোনো রেস্ট হাউস সংস্কার করে ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের কাজ শুরু করা হয়।

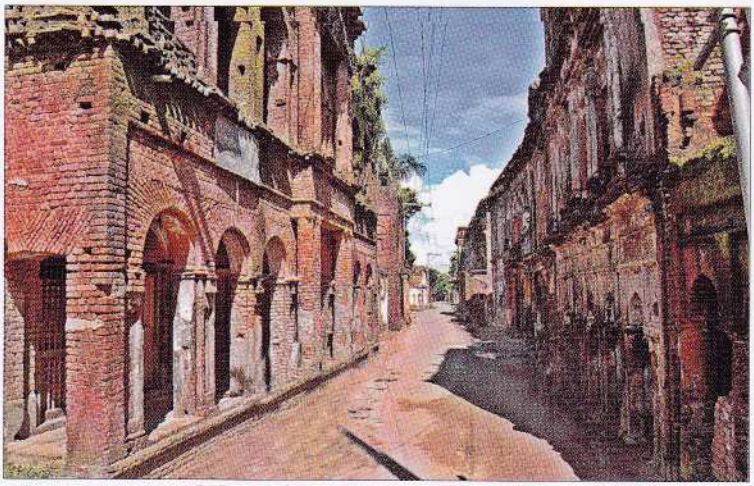

পানাম সিটির সারিবদ্ধ ইমারত, মুঘল ও ব্রিটিশ আমল

নীলকুঠি

'নীল এক প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। ইংরেজি, ফার্সি ও জার্মান ভাষায় এর নাম Indigo, সংস্কৃত ভায়ায় এটি নীলিকা নামে পরিচিত। হিন্দি ও বাংলায় নীল। নীল গাছের প্রজাতি এক রকম নীল বর্ণের পদার্থ বা নীল উৎপন্ন করে, যা প্রাচীনকাল থেকে রঞ্জক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পৃথিবীতে ২৫০-৩০০ প্রজাতির নীল গাছ আছে। ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ প্রকার নীল গাছ দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি প্রাকৃতিক নীল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ভারতবর্ষ থেকে

রপ্তানি করা হতো। তবে কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের পর এর গুরুত্ব কমে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীল ছাড়া এদেশে অন্য ফসল আবাদ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন জায়গায় নীলকুঠি স্থাপিত হয়। নীলচাষ বাঙালি জীবনে একটি নেতিবাচক ইতিহাসের করুণ অত্যাচারিত হবার ইতিহাস। ১৮৫৯-৬১ সময়কালীন সংঘটিত নীল বিদ্রোহের পর বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চল থেকে নীল চাষ উঠে যায়।'[১২]

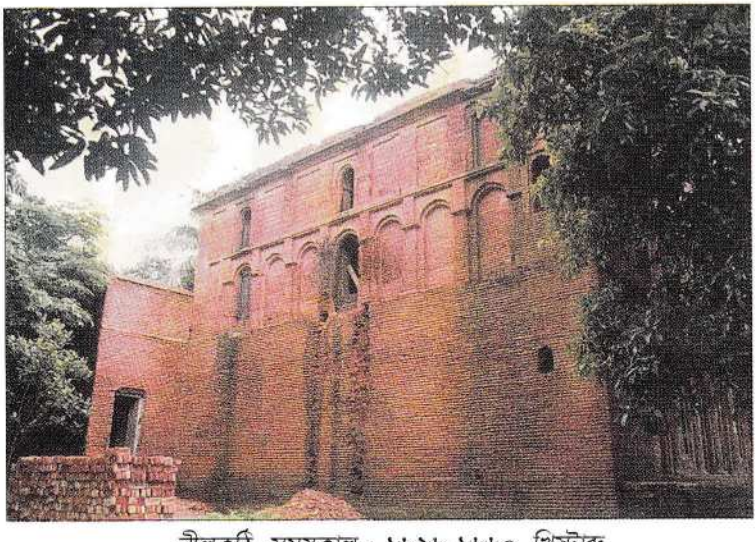

নীলকুঠি, সময়কাল : ১৬২৬-১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ

আলোচিত নীলকুঠি ঐতিহাসিক পানাম ব্রিজ থেকে সামান্য দূরে উত্তর দিকে দুলালপুর রোডে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যিক ইমারত। জানা যায়, শুরুতে নীলকুঠি কোম্পানীর মসলিন ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রের দফতর ভবন ছিল। পরে এটি নীল ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে পরিখ্যাত হয়। এটি মূলতঃ ঔপনিবেশিক শাসনামলে নীলকরদের নীল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নির্মিত ভবন। নীলকুঠির সম্মুখ দিকে খিলান আকৃতির চুন-সুররি দ্বারা তৈরি ইমারত। আলোচ্য নীলকুঠির ভিতরে উন্মুক্ত করিডোর নক্শা অনুসরণ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীল তৈরির কারখানা ছিল। ১৬২৬ হতে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নীলকুঠি নির্মিত হতে পারে। এতে মুঘল স্থাপত্যশৈলী এবং আঞ্চলিক অলংকার নক্শা সংযোজিত হয়েছে। নীলকুঠি বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁয়ের একটি উল্লেখযোগ্য ইমারত।

স্মৃতিতে অম্লান পানাম সিটি

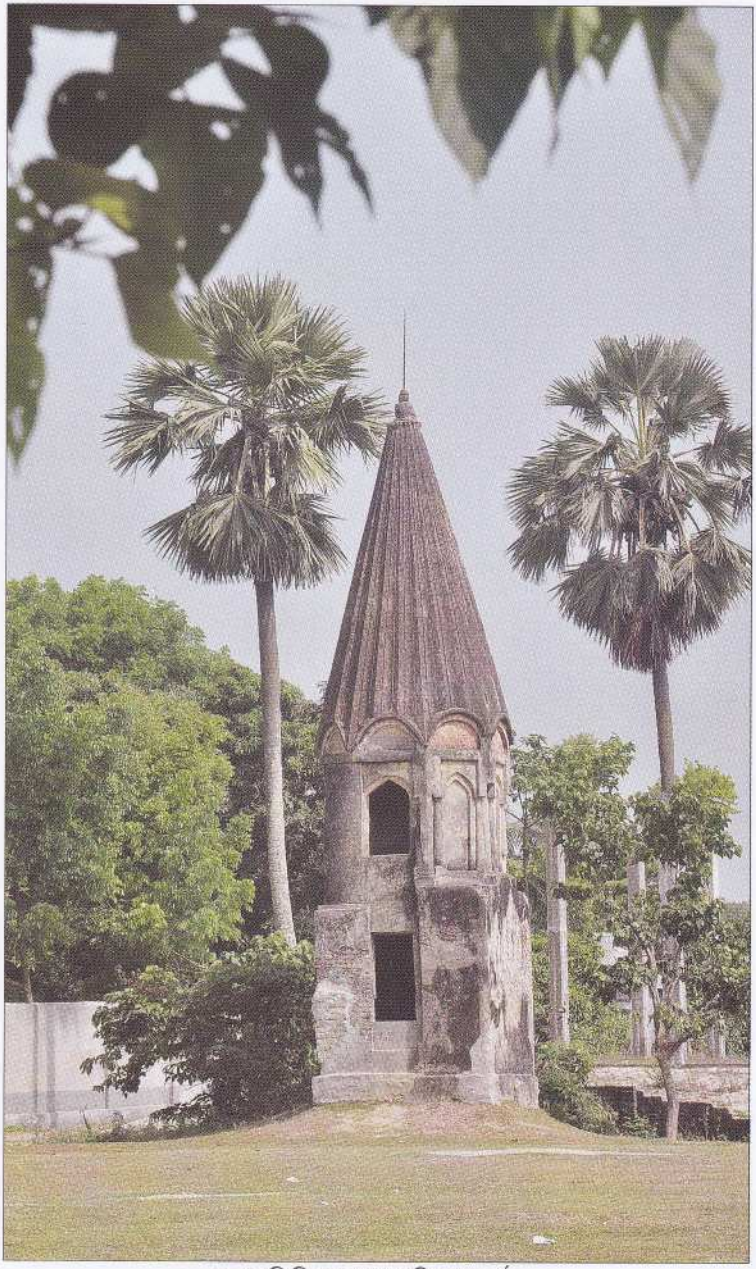

পানামসিটি সংলগ্ন আমিনপুর মঠ

পানাম সিটি যার সাথে জড়িয়ে আছে সোনালি অতীতের স্মৃতি। পরিখা পরিবেষ্টিত ঘুমন্তপ্রায় এ শহর জমিদার ব্যবসায়ী পর্যটককের পদভারে মুখরিত থাকতো। অনিন্দ্যসুন্দর এসব অট্টালিকা যে কোনো ঐতিহ্যপ্রেমী ও সংস্কৃতিমনা মানুষের কাছেই মূল্যবান।

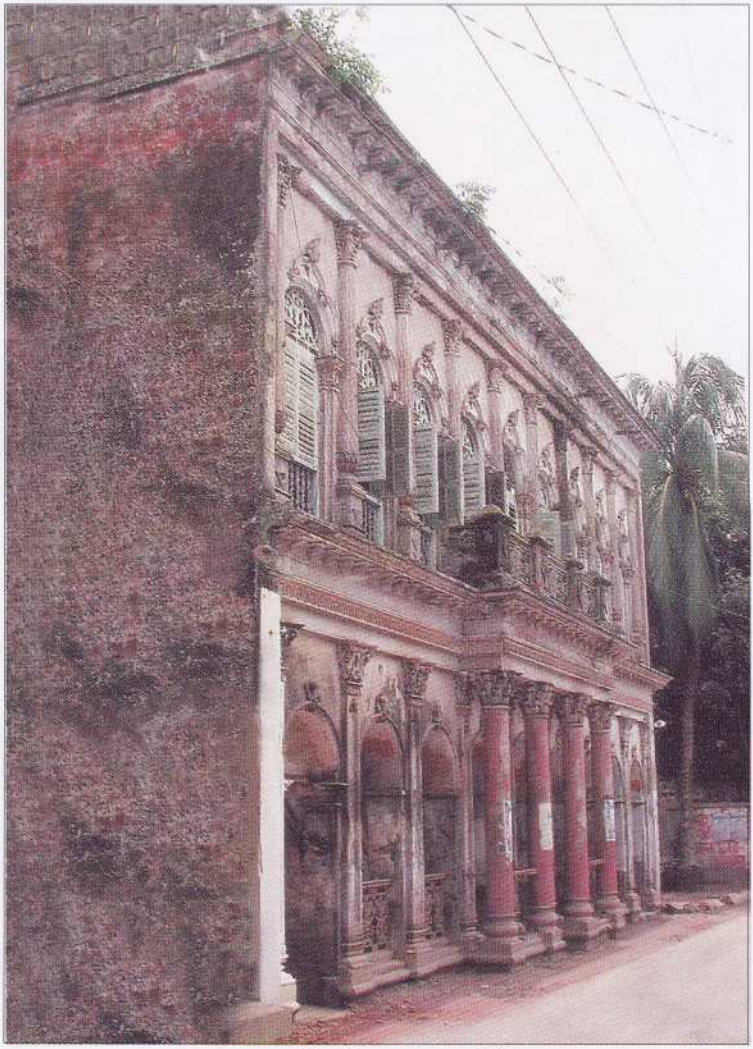

পুরোনো রেস্ট হাউস, মুঘল ও ব্রিটিশ আমল

পানাম ব্রিজ সংলগ্ন পঙক্ষীরাজ খাল

পানামসিটির নাচঘরের অভ্যন্তর ভাগ

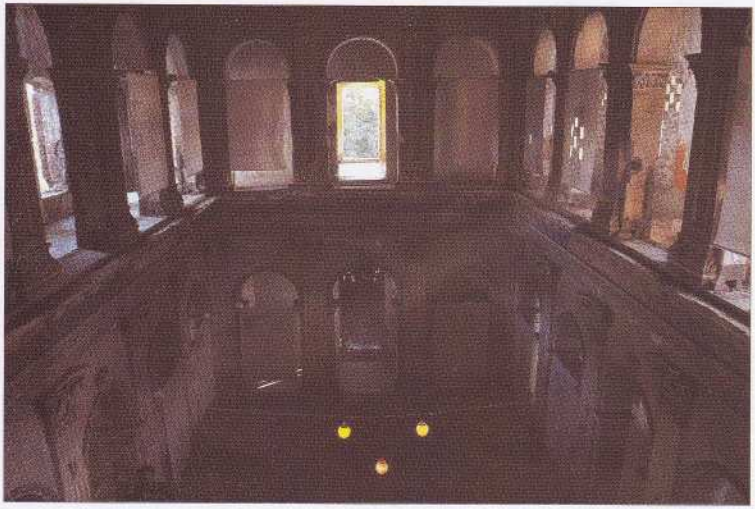

দরবার হল, মুঘল ও ব্রিটিশ আমল

রেস্ট হাউজের অভ্যন্তরভাগ, মুঘল ও ব্রিটিশ আমল

পানামের অলঙ্কৃত ইমারত ও কাশিনাথ ভবন

পানাম সিটির পরিখার একাংশ

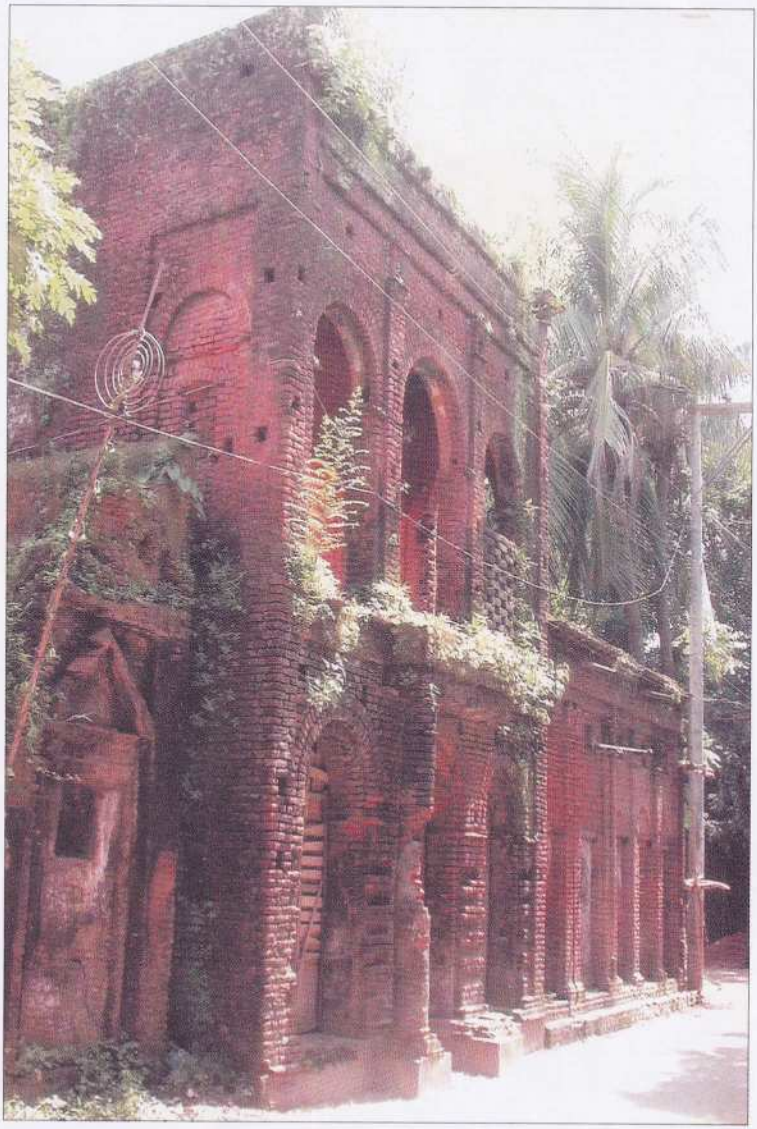

পানাম সিটির প্রাচীন ইমারত

পানাম ব্রিজ

মুসলিম শাসন আমলে পানাম সিটিতে নির্মিত ব্রিজটি পানাম ব্রিজ নামে পরিচিত। দুলালপুর ও পানাম অঞ্চলের মধ্যবর্তী পঙ্ক্ষীরাজ খালের উপর এটি নির্মিত। চুন-সুরকির গাঁথুনিতে জলাভূমির মধ্যে উঁচু করে বৃত্তাকার ইট সংযোগে তিনটি খিলান দ্বারা ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়। এর কেন্দ্রীয় খিলানটি অন্য দু'দিকে নির্মিত খিলান থেকে বড়। ব্রিজের উপরিভাগ কেন্দ্রস্থল থেকে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। 'এটি ৪.২৪ মিটার প্রশস্ত এবং তলদেশ থেকে এর উচ্চতা ছিল প্রায় ৮.৪৮ মিটার। পাশের দুটি খিলান ছিল ২.২৭ মিটার করে প্রশস্ত এবং ৪.২৪ মিটার করে উঁচু। মাঝের স্তম্ভগুলো ছিল ২.২১ মিটার করে পুরু। পুলের দৈর্ঘ্য ছিল ৫২.৬ মিটার। সেতুর নিচ দিয়ে নৌকা চলাচলের সুবিধার জন্য এটি নির্মিত হয়েছিল।'[১১] সেতুটি ১৭শ শতকে নির্মিত বলে জানা যায়। পানাম ব্রিজ মুঘল আমলের স্থাপত্যকীর্তির একটি অনুপম নিদর্শন। এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি।

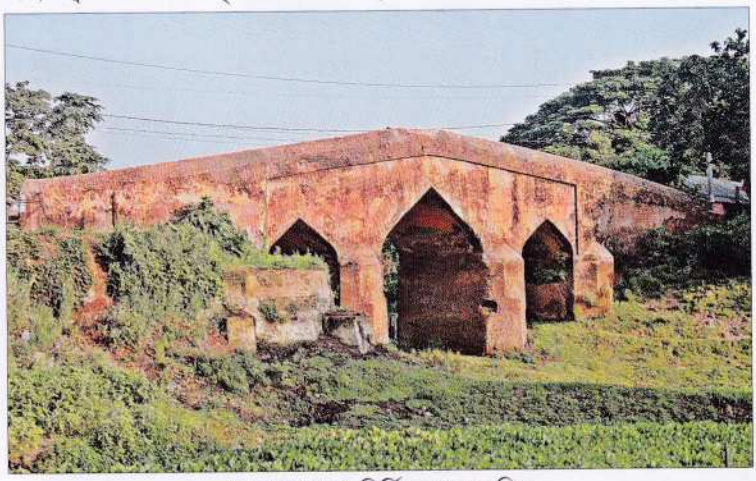

মুঘল আমলে নির্মিত পানাম ব্রিজ

ট্রেজারার হাউস

এটি সরকারি কোষাগার হিসেবে পরিচিত। সোনারগাঁও পৌরসভার সন্নিকটে আমিনপুর মহল্লায় ট্রেজারার হাউস বা ক্রোড়ি বাড়ি অবস্থিত। দ্বিতল এই ইমারতটিতে দোচালা স্থাপত্যশৈলী ব্যবহৃত হয়েছে। সরু জাফরি ইটের তৈরি ভবনের চারদিক প্রাচীর দেয়ালে সংরক্ষিত ছিল। ক্রোড়ি বাড়ির উত্তর পাশে ছিল শান বাঁধানো বড় দিঘি। সোনারগাঁয়ের

সোনালি দিনে এ বাড়িটি রাজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পদভারে মুখরিত থাকতো। মুসলিম ও সনাতন স্থাপত্যের সংমিশ্রণে ক্রোড়ি বাড়ি নির্মিত। ইমারতের দেয়ালগাত্রে লতাপাতার ঢেউ খেলানো ফুলেল অলঙ্করণশৈলী পরিলক্ষিত হয়। ইমারতটির ভেতরে অসংখ্য কুঠরি দেখে এটিকে ট্রেজারার হাউস বলে অনুমিত হয়।

জনশ্রুতি রয়েছে, 'ক্রোড়ি বাড়ির মাটির নিচের কুঠরিতে সোনার মোহর এবং সরকারি মুদ্রা সংরক্ষিত রাখা হতো। এখানে এক ক্রোড় টাকার ভাণ্ডার ছিল। এজন্য জনসাধারণ্যে ট্রেজারার হাউস ক্রোড়ি বাড়ি হিসেবে পরিচিত। এছাড়া সম্রাট আকবরের শাসনামলে পরগণার রাজস্ব অধিকর্তা ও রাজস্ব সংগ্রাহকের পদবি ছিল ক্রোড়ি।' ঐতিহাসিক ব্রাডলিবার্ট রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল গ্রন্থে আলোচ্য ক্রোড়ি বাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে স্বরূপ চন্দ্র রায় উল্লেখ করেন, 'শামসুদ্দিন আবুল মোজাফফর শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা সোনারগাঁয়ে মুদ্রিত হয়েছিল।' রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় চারশত বছরের পুরোনো ট্রেজারার হাউসের জৌলুস ম্লান হয়ে গেছে।

সুলতানি আমলে নির্মিত ক্রোড়ি বাড়ি

পোদ্দারবাড়ি

এটি সোনারগাঁয়ের উল্লেখযোগ্য একটি বাড়ি। সোনারগাঁও পৌরসভা ভবনের সন্নিকটে বাড়িটির অবস্থান। এক সময় এ বাড়ির নাম ছিল 'সোনাঝিল'। এখন এলাকায় এটি আওয়াল মঞ্জিল হিসেবে পরিচিত।

পানাম সিটি সংলগ্ন পোদ্দারবাড়ির মূল ভবন

পোদ্দারবাড়ির একাংশ

পোদ্দারবাড়ির বাগানের ফটক

পোদ্দারবাড়ির কড়িডোর নকশা

পূর্বে এ বাড়ির মালিক ছিলেন আনন্দ মোহন পোদ্দার। পরবর্তীতে জনাব আওয়াল সাহেব ক্রয়সূত্রে বাড়ির মালিকানা স্থানান্তরিত করেন বলে জানা যায়। জনসাধারণ্যে প্রচলিত আলোচিত পোদ্দারবাড়িতে অসংখ্য কক্ষ রয়েছে। এর নির্মাণশৈলী সোনারগাঁও জাদুঘর অঙ্গনের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির অনুরূপ।

অনিন্দ্যসুন্দর এই বাড়ির সম্মুখভাগের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে শান বাঁধানো ঘাটসহ দুটি পুকুর আছে। সরজমিন দেখা গেছে পোদ্দারবাড়ির ভবন জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বাড়িটিতে কিছু নতুন অবকাঠামোও নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাচীনকালের চিহ্নস্বরূপ মুঘল আমল থেকে আলোচ্য বাড়ির পূর্বদিকে প্রবেশদ্বারের অবয়ব এবং পশ্চিম দিকে বহির্গমনের গেইটের নমুনা রয়েছে। সব মিলিয়ে বড়িটি খুব সুন্দর।

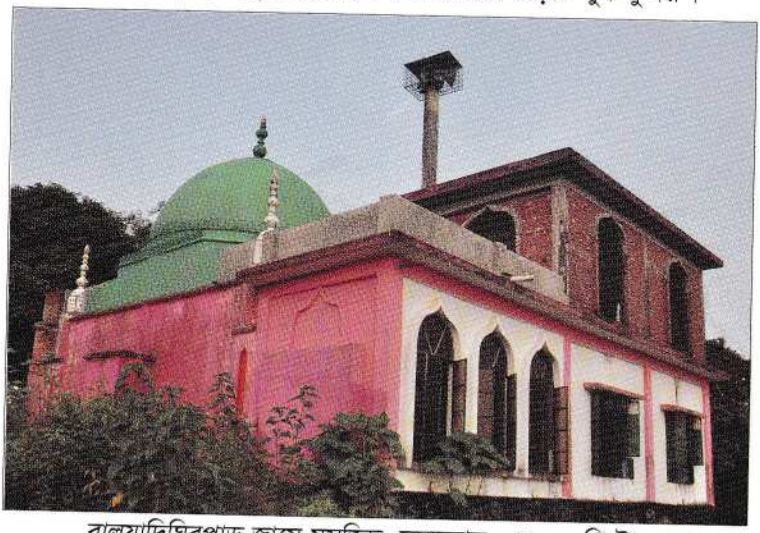

বালুয়াদিঘিরপাড় জামে মসজিদ, সময়কাল : ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ

বালুয়াদিঘিরপাড় জামে মসজিদ

মসজিদটি সোনারগাঁ উপজেলার বালুয়াদিঘিরপাড় গ্রামে অবস্থিত। এটি নির্মাণের তারিখ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ। আয়তাকার মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট। পশ্চিম দেয়ালে এটি এখনো কেন্দ্রীয় মিহরাব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য এ মসজিদের মুসুল্লিদের নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে সাম্প্রতিক সময়ে তিনদিকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তলার কাজ চলছে। আলহাজ মো. আবুল হাশেম মোল্লা জানান মসজিদের বর্তমান আয়তন পূর্ব-পশ্চিমে ৪৮ ফুট, উত্তর-দক্ষিণে-৪২ ফুট।

স্মৃতিঋদ্ধ ইমারত

সোনারগাঁ জি. আর. ইনস্টিটিউশন

পানাম সিটির এক শান্ত সুনিবিড় পরিবেশে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় সোনারগাঁ জি.আর. ইনস্টিটিউশন। শ্রী গঙ্গাবাসী পোদ্দার ও রামচন্দ্র পোদ্দার নামে দু'জন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব এ অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। এর আয়তন ৩.০৮একর। প্রতিষ্ঠানটির চারদিকে ভৌত অবকাঠামোর মধ্যভাগে উন্মুক্ত খেলার মাঠ রয়েছে। ১৯৯৫ সালে এটি উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় উন্নীত হয়। এটি সোনারগাঁয়ের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সোনারগাঁ জি.আর. ইনস্টিটিউশন

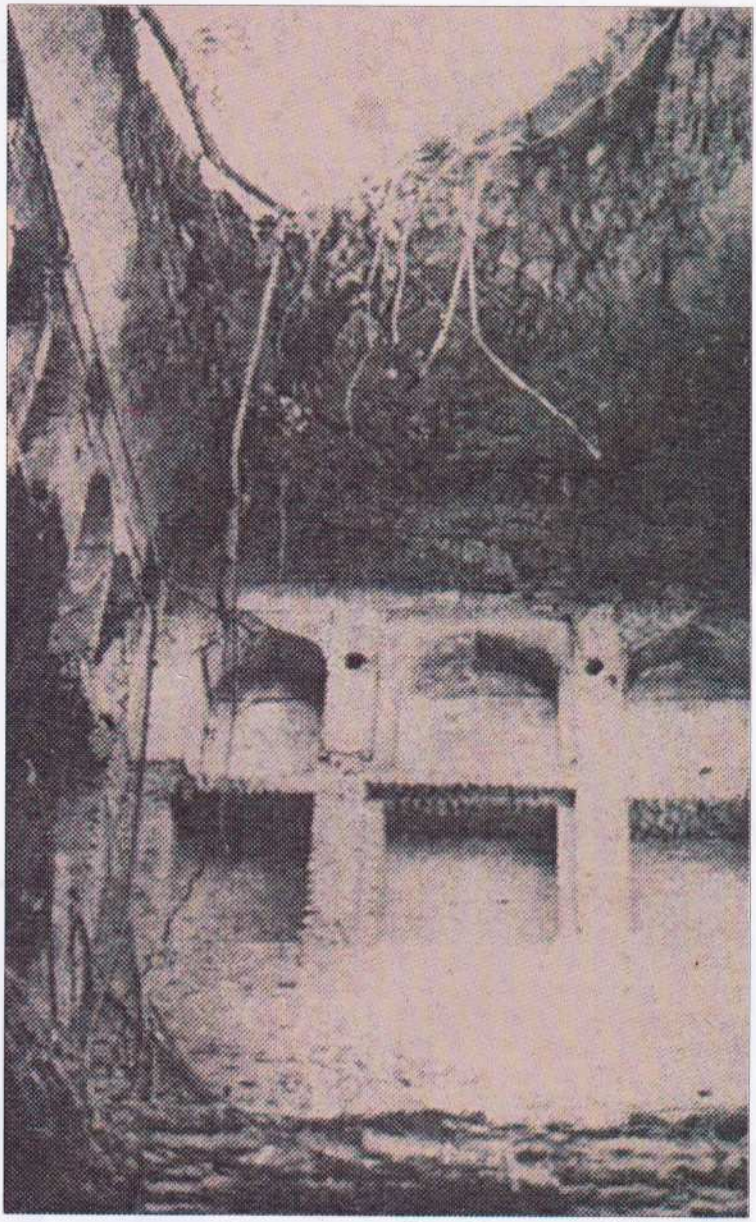

সংস্কারের পূর্বে ছাদভাঙ্গা গোয়ালদি মসজিদ, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ

গোয়ালদি মসজিদ

সোনারগাঁয় মুসলিম সুলতানদের প্রধানকীর্তি ঐতিহাসিক গোয়ালদি মসজিদ। বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে জনৈক মোল্লা হিজবার আকবর খান কর্তৃক ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদটি নির্মিত হয়। ড. ওয়াইজ এ মসজিদের নকশা ও অলঙ্করণ সম্পর্কে লিখেছেন', The interior of the mosque is 16½ feet square. the four walls, as they ascend, give place to the eight walls of an octagon.At each comer are quarter domes or arche (i.e.squinch arch). and the dome rises from the pen-dentives. As usual there mihrabs of arched recesses. The central one is formed of dark basaltic stones, beautifully carved and ornamented with arabesque work. The two side ones are of brick, boldly cut and gracefully arranged. The bricks in the archways have been grounded and smoothed by manual labour. The pillars at the door-ways are of sandstone.It was used as a mosque upto 1852 A.D.[১৩] বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এসএম,তাইফুর অত্যন্ত মনোরম এ মসজিদ পরিদর্শনকালে বলেন, Its stone door frame, artistic mihrab and pulpit and its inscription slabs in beautiful cursive Arabic is thrown there. এর পাথরের দরজার ফ্রেম, শিল্পমণ্ডিত মিহরাব ও মিম্বার এবং সেখানে সুন্দর আরবি নাসখি হরফে খোদিত শিলালিপির ফলক দেখতে পান।

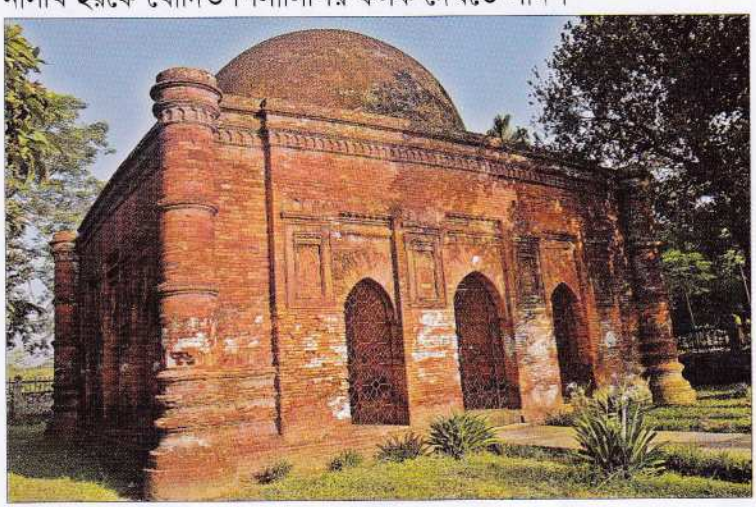

সংস্কারের পর ঐতিহাসিক গোয়ালদি মসজিদ

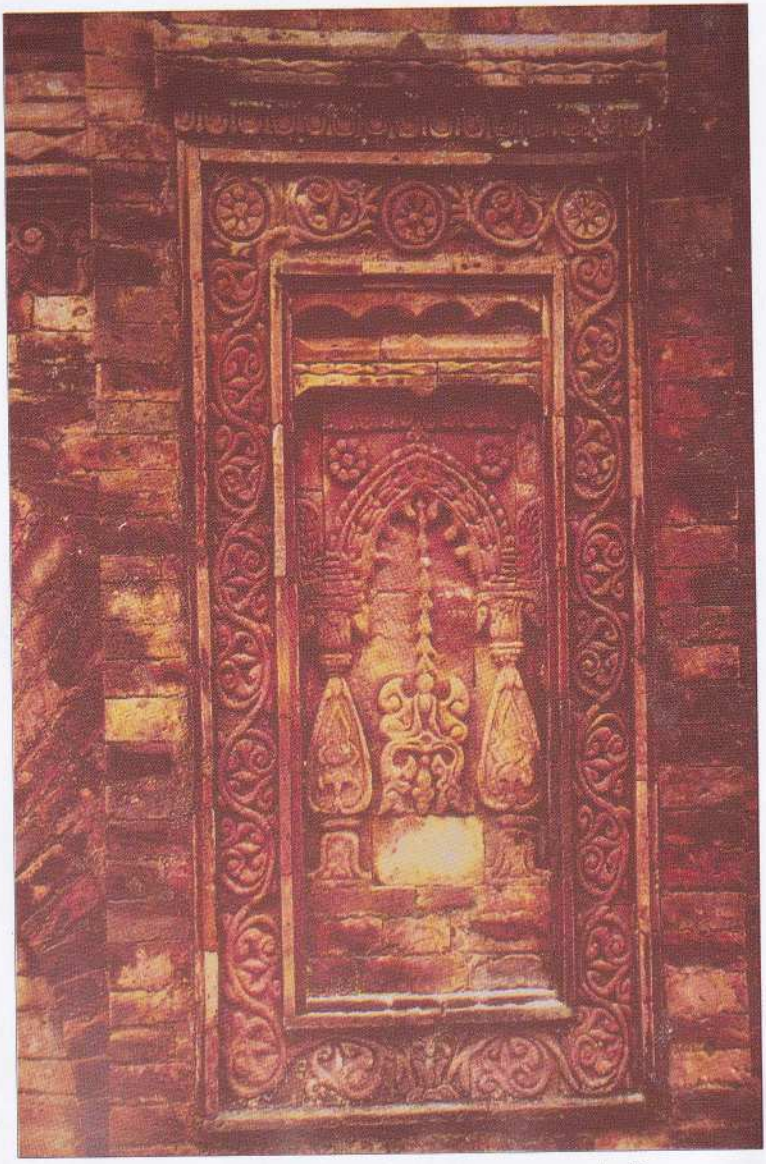

ঐতিহাসিক গোয়ালদি মসজিদ দেয়ালের অলঙ্করণশৈলী

ভারতের গৌড়, পান্ডুয়া ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের ইমারতের ন্যায় এ মসজিদের ভিতর ও বাইরের দেয়ালের পাথর এবং ইটের উপরে মুসলিম ঐতিহ্যগত আরবীয় অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয়।

স্যার কানিংহাম এর মতে, 'বাইরের দিকে এ মসজিদের আয়তন ছিল ৭.৯২ মিটার এবং দেয়ালগুলো প্রায় ১.৬১ মিটার প্রশস্ত। দেয়ালের দু'দিকেই পোড়ামাটির চিত্র ফলক ছিল। পূর্ব দেয়ালের ৩টি প্রবেশ পথ চওড়া ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে অনুচ্ছ প্রবেশ পথ ছিল। পাশের মিহরাব দু'টিতে মনোরম চিত্র ফলকের কাজ ছিল।'[১৪]

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংস্কারের পূর্বে ইরাতের গম্বুজ এবং দক্ষিণ দেয়ালের প্রধান অংশ, পূর্ব ও উত্তর দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছিল। শুধু পশ্চিমের কিবলা দেয়ালটি টিকে ছিল। মসজিদটিতে সংস্কার কাজ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের চারকোণায় চারটি গোলায়িত কর্ণার টাওয়ার রয়েছে। এ টাওয়ারগুলো সুলতানি রীতিতে ছাদের সীমানা শেষ হয়েছে। মৌল্ডিং-এর মাধ্যমে টাওয়ারগুলো কয়েকটি অংশে বিভক্ত। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে অষ্টকোণ কর্ণার টাওয়ারের পরিবর্তে গোলায়িত কর্ণার টাওয়ারের মসজিদ হিসেবে এটি একমাত্র উদাহরণ।

মসজিদে বর্গাকার জুল্লাহর অভ্যন্তরভাগে প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ৪.৯০ মিটার। জুল্লাহর চতুর্দিকে ১.৬৫ মিটার প্রশস্ত দেয়াল রয়েছে। মসজিদে প্রবেশের জন্য পাঁচটি খিলানপথ রয়েছে। তন্মধ্যে পূর্ব দেয়ালে তিনটি। মধ্যবর্তী কেন্দ্রীয় খিলানপথটি উচ্চতা ও প্রশস্ততায় পার্শ্ববর্তী দু'টোর চেয়ে বড়। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের কেন্দ্রে দুটি খিলানপথ রয়েছে। এ গুলো অগভীর প্যানেলের মধ্যে সংস্থাপিত। এখানে দ্বিকেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব দেয়ালের তিনটি প্রবেশপথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। প্রধান প্রবেশপথ বরাবর কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অবস্থিত। এ মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাব দু'টি থেকে উচ্চতা ও প্রশস্ততায় বড়। প্রধান মিহরাবে কালো পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। অপর দু'টি মিহরাব ইটের নির্মিত। প্রধান মিহরাবের সম্মুখ দিকে খাঁজ খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। এ খিলান পার্শ্ববর্তী অলঙ্কৃত অষ্টকোণ পিলাস্টার থেকে উঠে গেছে এবং বর্শা আকৃতির শিরোভাগে সমাপ্ত হয়েছে। পশ্চিম দেয়ালের বহির্গাত্রে প্রধান মিহরাবের অবস্থান দেখানো হয়েছে। মসজিদের অবতলাকৃতি এ মিহরাবগুলো গোলায়িত। মসজিদের অভ্যন্তরে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের চার কোণে চারটি আয়তাকার কুলুঙ্গি

রয়েছে। এখানে টেরাকোটা নকশায় যেসব মোটিফ পাওয়া যায়, তা সোনারগাঁয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের প্রস্তর নির্মিত সমাধিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। গোয়ালদি মসজিদ সোনারগাঁয়ের সর্বাধিক অলঙ্কৃত ইমারত। এর পুরু ইটের পৃষ্ঠভাগ টেরাকোটা অলঙ্করণ রীতিতে খোদাই করা।

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে এক গম্বুজ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গোয়ালদি মসজিদ খুবই আকর্ষণীয়।

শাহ আবদুল হামিদ মসজিদ

ঐতিহাসিক গোয়ালদি মসজিদের উত্তর দিকে এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদই শাহ আবদুল হামিদ মসজিদ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শাহ আবদুল হামিদ নামক একজন সাধক ১১১৬ হিজরি মোতাবেক ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে মসজিদটিতে সাম্প্রতিককালে সম্প্রসারণ কাজ করা হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দক্ষিণ আঙিনায় নির্মাতার সমাধি রয়েছে। এ মসজিদটি মুঘল আমলের একটি আকর্ষণীয় নিদর্শন।

শাহ্ আবদুল হামিদ মসজিদ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোক সংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং এ বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এ দেশের লোকশিল্প ও লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের এক সমৃদ্ধ জায়গা সোনারগাঁও। এখানকার লোক ও কারুশিল্প বিখ্যাত মসলিন, ঝিনুক, মুক্তার কাজ, কাঠের চিত্রিত হাতি ঘোড়া পুতুল ইত্যাদি একদা রপ্তানির মর্যাদা পেয়েছিল। এমন লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনারগাঁয়ে ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবন তথা বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে প্রথম আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে এদেশের মাটি ও মানুষের শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন পরিচালনার দায়িত্ব দেন। ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

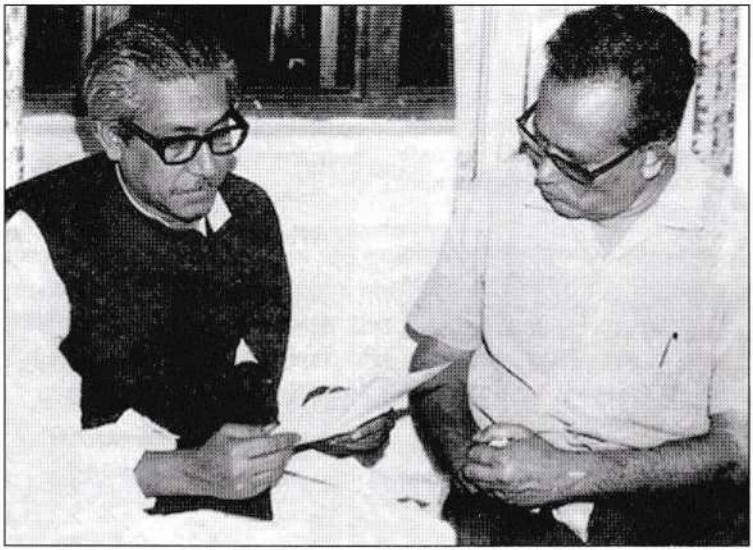

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর প্রথম আর্থিক সাহায্য, পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ একটি প্রজ্ঞাপন বলে সরকার বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে

এ প্রসঙ্গে দেশবরেণ্য শিল্পী হাশেম খান ও জয়নুল আবেদিন শীর্ষক এক নিবন্ধে লিখেছেন,"আজ আপনার স্বপ্ন-এই বিধ্বস্ত বাংলাকে সোনার বাংলা রূপে গড়ে তুলবেন। বাংলার মানুষ আপনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য তৈরি, আপনি ডাকুন। বঙ্গবন্ধু অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন সংবিধান গ্রন্থটি। তারপর বললেন–আবেদিন ভাই, আপনি তো আমার কাজটা করে দিলেন। এখন আমি আপনাদের জন্য কী করতে পারি বলুন। আমি এবার একটা কাজে হাত দিতে চাই। আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন। শিল্পাচার্য বঙ্গবন্ধুকে বলতে লাগলেন- ঢাকার পাশে যে ঐতিহাসিক শহর সোনারগাঁ, সেই সোনারগাঁকে আমি নতুনরূপে গড়ে তুলতে চাই। এই অঞ্চলেই তৈরি হতো সারা বিশ্বখ্যাত শিল্পকর্ম 'মসলিন' যা আজ হারিয়ে গেছে। এমনিভাবে বাংলার অনেক ঐতিহ্য ও শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এখনই পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সোনারগাঁয়ে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের লোকশিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের শিল্পকর্মে উৎসাহ প্রদান ও উজ্জীবিত করার প্রয়াসে আমি একটি বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়েছি। আর তা বাস্তবায়নে আপনার সাহায্য ও উৎসাহ প্রয়োজন। সোনারগাঁকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলে আপনার সোনার বাঙলা গড়ার কাজ অনেকখানি এগোবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বঙ্গবন্ধু একটু অবাক হয়ে শিল্পাচার্যের দিকে তাকালেন। একটু সময় নিলেন। সংবিধানের পাতা উল্টাতে উল্টাতে আনন্দ ও বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন–আবেদিন ভাই, আপনি আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী এখনই কাজে নেমে যান। আমি এবং বাংলাদেশ সরকার আপনাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। শুধু আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ, সোনারগাঁয়ে মাঝে মাঝে আমি আপনার কাছে গিয়ে থাকব। আমার জন্য আপনার পাশে একটু জায়গা রাখবেন। সুন্দর কিছু সৃষ্টি করার শক্তি ও প্রেরণা আপনার কাছ থেকে যাতে পেতে পারি ও শিখতে পারি সেই ব্যবস্থা আমাকে করে দেবেন। সংবিধান এবং সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন-দুটি মানুষের কথোপকথন। আমি সেদিন বিমোহিত। মহামানব দেখতে কেমন হয়-এমন কোনো ধারণা আমার নেই। কিন্তু সেদিন এ দুজনকে আমার মনে হয়েছে-দুই মহামানবের সম্মুখে আমরা।

বিশাল বক্ষ দুজনের। যে বক্ষ ধারণ করে আছে বাংলার আপামর মানুষকে। সোনারগাঁ ও সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে। দুজনের মধ্যেই

এক অদ্ভুত মিল। এই দুই মহামানব হারিয়েও গেছেন আমাদের মাঝ থেকে প্রায় একইভাবে। দুজনকেই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে মানবজাতির শত্রুরা- দুর্বৃত্ত ও দুর্জনরা।

শিল্পাচার্যকে অকস্মাৎ ছিনিয়ে নিল-দুরারোগ্য ক্যান্সার আর বঙ্গবন্ধুকেও অকস্মাৎ হত্যা করল কিছু দুর্বৃত্ত-সৈন্য। যারা বাংলার শত্রু, মানবজাতির শত্রু।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য পরিদর্শন করেন পর্যটকগণ

ইতোমধ্যে এ ফাউন্ডেশনটি দীর্ঘ ৪১ বছর অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অতিক্রম করেছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্থাপন করেন শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প আইন মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয় এবং ৬ মে ১৯৯৮ তারিখের গেজেটে তা প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালে সোনারগাঁয়ে কারুশিল্পগ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের কাজও আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই সম্পন্ন হয়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পুনর্বার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখের পুষ্পিত বাগানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণদানের

আদলে পিতলের তৈরি সুউচ্চ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। এটি সোনারগাঁও এলাকার জনগণের জন্য সর্বোপরি বাঙালি জাতির জন্য গৌরবের বিষয়। এখানে ইতোমধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের একটি আবক্ষ ভাস্কর্য ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল-এর ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। ভাস্কর্য তিনটিই ভাস্কর শ্যামল চৌধুরীর সৃষ্টি কর্ম। ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৩৮ বছর পর ২০১২ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, কর্মচারিগণের জন্য অবসরকালীন পেনশন ভাতা প্রবর্তনও করেছে বর্তমান সরকার।

দেশীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনে এখানে রয়েছে লোকশিল্প জাদুঘর, শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর এবং আরো সৌন্দর্য বর্ধনসহ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

বাংলার প্রাচীন রাজধানীর ইতিহাস-ঐতিহ্য অবলোকনে বছরে দশ লক্ষাধিক দেশি-বিদেশি পর্যটক সোনারগাঁ পরিভ্রমণে আসেন। আমাদের লোক-লোকালয়ের জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ লোকশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। সব মিলিয়ে দেশের লোকজ ঐতিহ্য বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী

১৯৯৮ সালের ৮নং আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ যথা :

(ক) ঐতিহাসিক লোক ও কারুশিল্পের সংরক্ষণ করা;

(খ) কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা;

(ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁয়ে একটি শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা;

(ঙ) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাদির প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

(চ) লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উৎসাহ প্রদান;

(ছ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(জ) লোক ও কারুশিল্পের গবেষণায় নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা;

(ঝ) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারের সাহায্য

করা এবং তৎসম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশি, বিদেশি ও আন্তর্জাতিক লোক ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে একই বিষয়ে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা;

(ট) উপরোল্লিখিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাজ করা।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ১৭০ বিঘা আয়তনের অঙ্গন পাখির কলকাকলিতে মনোমুগ্ধকর। এর বিস্তৃত জায়গায় দৃষ্টিনন্দন লেক, পুকুর, গ্রন্থাগার, বিক্রয়কেন্দ্র, ভাস্কর্য, লোকজ রেস্তোরাঁ, ব্রিজ, কারুপল্লী/জামদানি পল্লী, কারুশিল্পগ্রাম, মানুষকে প্রকৃতির নিমন্ত্রণে আকর্ষণ করে। এখানে বড়শিতে মাছ শিকার, নৌকায় ভ্রমণ, নাগর দোলায় চড়ার ব্যবস্থাসহ জাদুঘর থাকায় দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে পড়েন।

বড় সরদারবাড়ি লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

জাদুঘর হলো সাংস্কৃতিক উপাদান উপকরণের সংরক্ষণ ও প্রদর্শনাগার। একটি দেশের প্রতিচ্ছবি জাদুঘর। এটি জাতীয় গৌরবের প্রতীক। লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর এ দেশের সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশেষায়িত সংগ্রহশালা।

প্রাথমিকভাবে পানাম সিটিতে ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলাদেশের লোক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্যবান নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশেষায়িত এ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বর্তমান কমপ্লেক্সের পুরোনো ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়িতে এ জাদুঘর স্থানান্তরিত হয়।

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

জয়নুল আবেদিন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন। তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। এই মহান শিল্পী ১৯৭৬ সালের ২৮ মে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসাধারণ শিল্পমানসিকতা ও স্বপ্নময়-কল্পনাশক্তির জন্য তিনি শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার আন্দোলনে তিনি নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করেছিলেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯ অক্টোবর ১৯৯৬ সালে ফাউন্ডেশন নতুন জাদুঘরটি শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর নামকরণ ও এ জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ জাদুঘরে গ্যালারির সংখ্যা তিনটি।

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর উদ্বোধন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করছেন

বিক্রয় কেন্দ্র

লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর কমপ্লেক্সের দৃষ্টিনন্দন স্থানে বেড়ানো ও বিকিকিনির জন্য ক্রেতাদের রুচি, চাহিদা ও সামর্থ্যের দিক বিবেচনা করে নির্মাণ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বিক্রয় কেন্দ্র। এখানে জামদানি শাড়িসহ বিভিন্ন ধরনের কারুপণ্য বিক্রয়ে দর্শকদের সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় ঘটাতে প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

লোকজ রেস্তোরাঁ

আনন্দ, বিনোদন, বিকিকিনি এবং অভিজ্ঞতা লাভের প্রত্যাশায় আগত পর্যটকদের খাবারের চাহিদার বিষয়টি ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করে গ্রামীণ পরিবেশে লোকজ রেস্তোরাঁ নির্মাণ করেছে। প্রাথমিকভাবে এখানে আধুনিকমানের সব ধরনের খাবারের যোগান দেয়া সম্ভব না হলেও এর শুভ সূচনা আশার আলো বয়ে আনবে বলে প্রত্যাশা।

কারুশিল্পগ্রাম

বাংলাদেশ কারুশিল্পে প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্ভর কালচারাল হেরিটেজ রক্ষার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মননশীলতা, প্রকৃতি ও ব্যাপ্তির পরিচয়সহ কর্মরত কারুশিল্পীদের কর্মময় পরিবেশ প্রদর্শনের জন্য এবং এ পেশাটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতার লক্ষ্যে সোনারগাঁয় নির্মাণ করা হয় দেশের প্রথম শিল্পগ্রাম। নির্মাণ শিল্পে দেশজ উপাদান, উপকরণ, মানুষের ইচ্ছা, রুচি ও মননশীলতার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। এজন্য সহজলভ্য নির্মাণ বস্তুসামগ্রী দিয়ে এ শিল্পকে মানুষ বাস্তবরূপ দিয়েছে এবং এভাবেই ধীরে ধীরে আমাদের ঘরবাড়ি নির্মাণ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। লোকশিল্প জাদুঘরের পাশাপাশি আলোচিত কারুশিল্পগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক লোক জাদুঘর হিসেবে গণ্য হবে।

এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হয়েছে

* মৃৎশিল্পের কারুশিল্পীদের কর্মময়পরিবেশ এবং ঘরবাড়ি;
* কাঠের কারুশিল্পীদের কর্মময়পরিবেশ ও ঘরবাড়ি;
* বাঁশ, বেত, পাটি কারুশিল্পীদের কর্মময়পরিবেশ ও ঘরবাড়ি;
* শাখা-ঝিনুক ও মুক্তা কারুশিল্পীদের কর্মময়পরিবেশ ও ঘরবাড়ি;

* বস্ত্র কারুশিল্প, জামদানি, রেশম, টাঙ্গাইল শাড়ি, নকশি কাঁথা কারুশিল্পীদের কর্মময়পরিবেশ ও ঘরবাড়ি;

* পাটজাত কারুশিল্পীদের কর্মময়পরিবেশ ও ঘরবাড়ি;

* তামা-কাঁসা-পিতল, লোহার কারুশিল্পীদের কর্মময়পরিবেশ ও ঘরবাড়ি;

* হস্ত নির্মিত কাগজের কারুশিল্পীদের কর্মময়পরিবেশ ও ঘরবাড়ি।

কারুশিল্পগ্রামে কর্মরত কারুশিল্পী বীরেন্দ্র সূত্রধর ও দিপালী রাণী সূত্রধর

আমাদের হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা সংবলিত গ্রামীণ লোকজীবনের প্রতিচ্ছবি একটি সুসংহত লোকজ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মাধ্যমে এখানে মিনি বাংলাদেশ গড়ে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা চলছে। এতে থাকবে আবহমান বাংলার শাশ্বতরূপের বাস্তব অবকাঠামো, ভূমিরূপ, গ্রামীণ স্থাপত্যশৈলী, নদী-নালা, পাহাড়, হ্রদ, ঝর্ণা, বনাঞ্চল, চা-বাগান, সমুদ্র সৈকত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন ও পরিবেশ। এছাড়া বিভিন্ন বর্ণ ও গোষ্ঠীর মানুষের লোকজ পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের আঞ্চলিক লোককারুশিল্পকে ক্ষুদ্রাকারে উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধার এক নয়া দিগন্ত প্রস্তাবিত মিনি বাংলাদেশ প্রকল্পে থাকবে বলে আশা করা যায়।

লেকে মাছ শিকার

লোকশিল্প জাদুঘর পরিদর্শনে প্রতিদিন সোনারগাঁয় হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। তার মধ্যে এক ধরনের মানুষ আসেন জাদুঘরের দৃষ্টিনন্দন লেকে বড়শিতে মাছ শিকারের আনন্দ উপভোগের জন্য। এখানকার কৃত্রিম লেক পরিবেষ্টিত বিস্তৃত জলাভূমিতে মাছ শিকার ফি ১৭০০.০০ টাকা। প্রতি টিকিটে পাঁচটি বড়শিতে এখানে মাছ ধরা যায়। এক্ষেত্রে বড়শি, চাড়, পিঁপড়ার ডিম, রুটিসহ আনুষঙ্গিক সব খরচই শিকারীর নিজের।

লেকে বড়শিতে মাছ শিকার

কারুপল্লী

ফাউন্ডেশনের তৃতীয় গেইট সংলগ্ন মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুশিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে নির্মিত হয়েছে এ কারুপল্লীর বিপণন স্টল। এখানে শাপলা, নীলপদ্ম, অপরাজিতা, কৃষ্ণচূড়া, ঝুমকোলতা, মাধবীলতা, স্বর্ণকুমারী, সন্ধ্যামালতী, হাস্নাহেনা, সূর্যমুখি, রাঁধাচূড়া, চন্দ্রমল্লিকা, দোয়েল, নীলকণ্ঠি, গাংচিল, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, রাজহংসী, শঙ্খচিল, ধানশালিক, রজনীগন্ধা, মহুয়া, দোলনচাঁপা, নয়নতারা, নবগঙ্গা, মধুমতি, ধানসিঁড়ি, কুশিয়ারা, কর্ণফুলী, করতোয়া, ইছামতি, শঙ্খমালা, পালকি, তরুলতা, রূপসীবাংলা, জলকণা, স্বর্ণলতা, ময়ূরপঙ্খী, সোনারতরী, পদ্মরাগ, কুসুম-কলি, হিজলতলী,

নোলক, নকশি কাঁথা, সাঁজের ছায়া, সপ্ত-ডিঙা, প্রজাপতি ও বনলতা শিরোনামে ৪৮টি স্টল আছে। কারুশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়াসে জামদানি শাড়িসহ কারুপণ্যসামগ্রী তৈরি, প্রদর্শনী ও সুলভে বিক্রয়ের বিশেষ ব্যবস্থা কারুপল্লীতে নেয়া হয়েছে।

লোকশিল্পের বিপণন কুঠির, সময়কাল : ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

১ বৈশাখের আনন্দ উৎসব, লেকের জলে বাউলের আসর ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

বিনোদন চত্বর

সোনারগাঁ জাদুঘর পরিদর্শনে আগত পর্যটকদের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াসে প্রতিষ্ঠানের নতুন অধীগ্রহণকৃত জায়গায় ছায়া ঢাকা শ্যামল, স্নিগ্ধ হৃদয় জোড়ানো নিরিবিলি পরিবেশে নির্মাণ করা হয়েছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা নামের বিনোদন চত্বর।

এ আয়োজন অতীত ও বর্তমানের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সেতুবন্ধন রচনায় ভূমিকা রাখবে।

ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে আগত দর্শনার্থীদের ভিড়

ছোট সরদারবাড়ি

সোনারগাঁয়ের প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে ছোট সরদারবাড়ি অন্যতম ইমারত। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ-পূর্বদিকে এ ভবনটি অবস্থিত। মুঘল স্থাপত্যকলার বিন্যাসে বাড়িটি অলঙ্কৃত। দ্বিতল বাড়িটির ছাদে ওঠার জন্য সরুসিঁড়ি রয়েছে। ছাদের ওপরে প্রহরীদের ওয়াস টাওয়ার ছিল। ভবনটি চারদিকে পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এটিকে মুসা খানের প্রাসাদের প্রবেশদ্বার হিসেবে অভিহিত করা হয়। আলোচ্য ইমারতটি ছোট সরদারবাড়ি হিসেবে

পরিচিত। এটি প্রায় চারশত বছরের প্রাচীন নিদর্শন। সম্ভবত ছোট সরদার বাড়ির উত্তর পূর্ব দিকে বাগ-ই-মুসা বা মুসা খানের বাগান। অনুসন্ধিৎসু পর্যটকের কাছে আলোচ্য বাড়িটি একটি অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে সমাদৃত।

ছোট সরদারবাড়ি সংস্কারের পূর্বে

ছোট সরদারবাড়ি সংস্কারের পরে

আলোকচিত্রে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

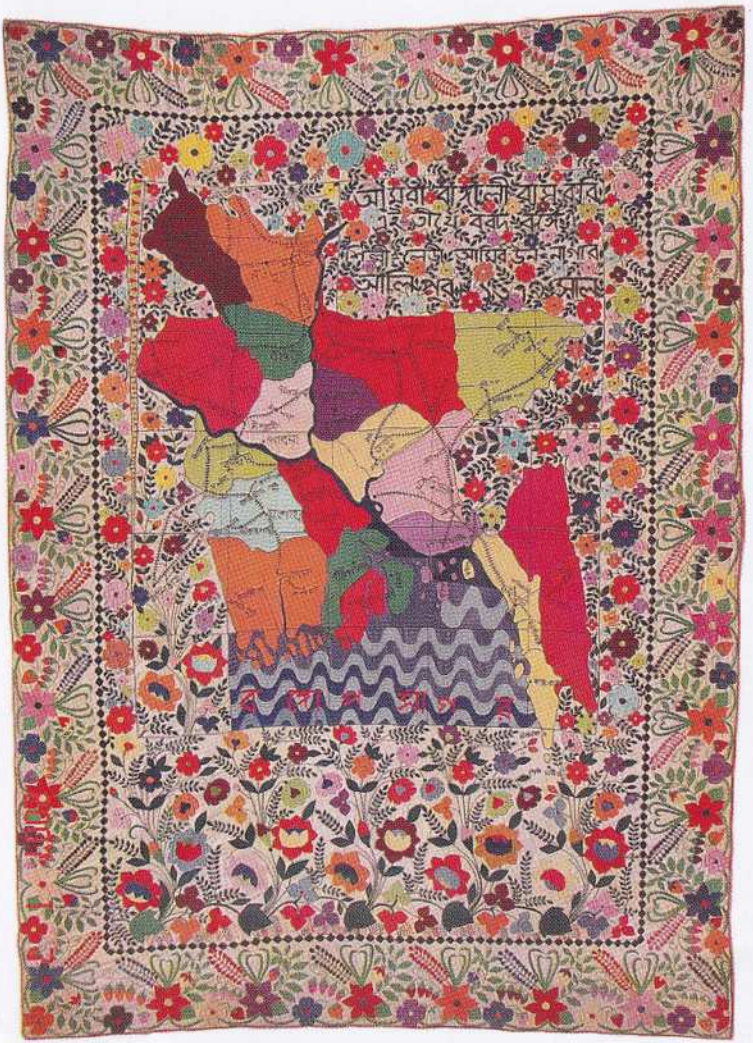

শিল্পী-লেডী আমিরউন-নাগার, আলিপুর, ১৩৭৯ সাল
জাদুঘরে প্রদর্শিত নকশিকাঁথায় বাংলাদেশ

মাসব্যাপী মেলায় কর্মরত কারুশিল্পী প্রর্দশনীতে কিশোরগঞ্জের টেপাপতুলশিল্পী সুনীলচন্দ্র পাল ও আরতি রাণী পাল

মাসব্যাপী মেলায় কর্মরত কারুশিল্পী প্রর্দশনীতে মুন্সিগঞ্জের শীতল পাটিশিল্পী সবিতা রাণী মোদি

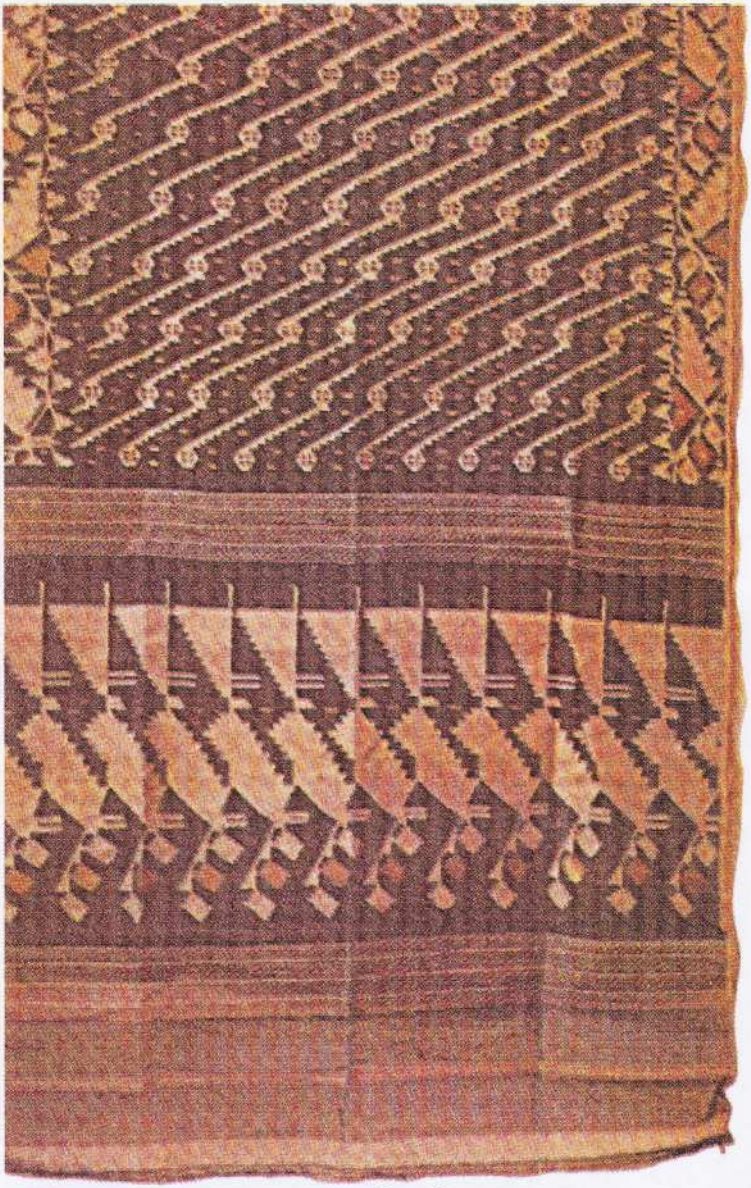

জামদানি শাড়ি

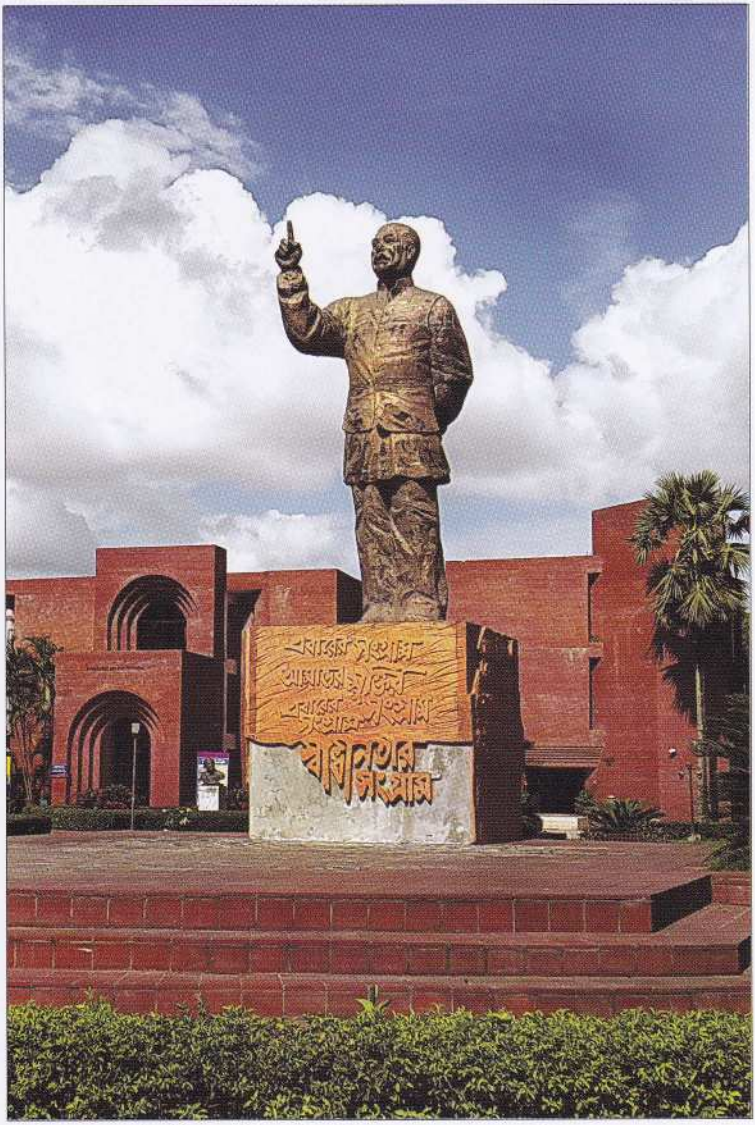

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুউচ্চ ভাস্কর্য, শিল্পী শ্যামল চৌধুরী, সময়কাল : ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে ভাস্করশিল্পী শ্যামল চৌধুরী নির্মিত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আবক্ষ ভাস্কর্য, সময়কাল : ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ভাস্কর্য
শিল্পী শ্যামল চৌধুরী, সময়কাল : ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

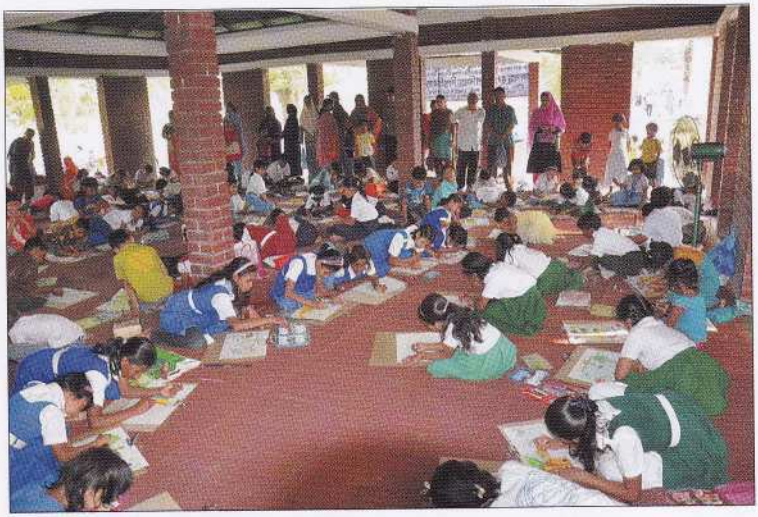

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনে ক্ষুদে আঁকিয়ে

মাসব্যাপী লোকজ মেলায় কর্মরত শখের হাঁড়ি শিল্পী সুশান্ত পাল

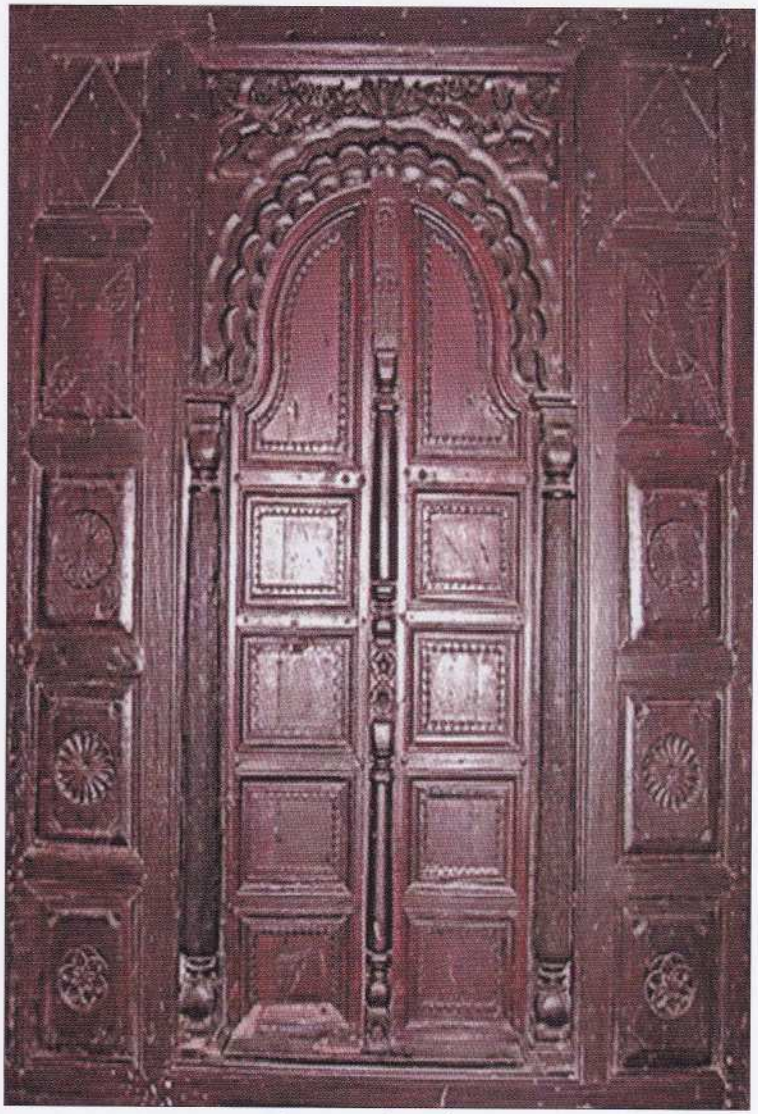

গ্যালারিতে প্রদর্শিত কাঠের দরজা
প্রাপ্তিস্থান : ফরিদপুর, সময়কাল : ঊনবিংশতাব্দী

লোক ও কারুশিল্প গ্রন্থাগার

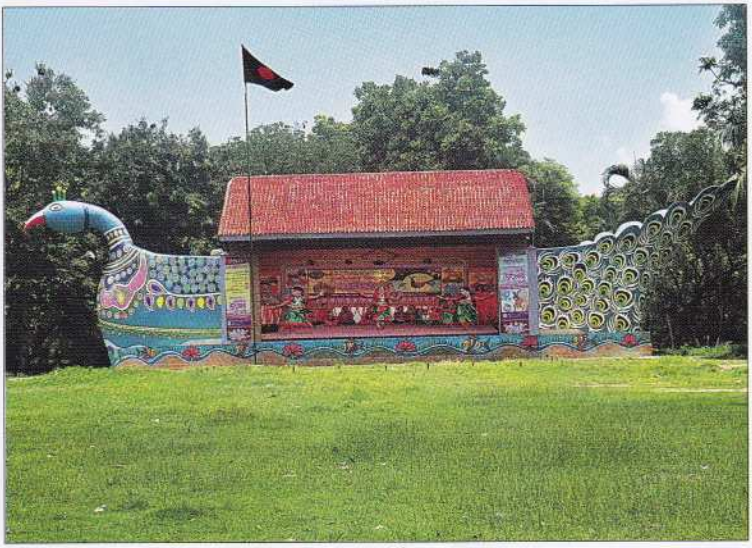

সোনারতরী মঞ্চ
পরিকল্পনা ও নকশা : কবি রবীন্দ্র গোপ

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রধান গেইট
অপেক্ষমান পর্যটকদের ভিড়

ফাউন্ডেশন অঙ্গনে লোক ঐতিহ্য নাগরদোলা

শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি, সঙ্গে আছেন শিল্পী হাশেম খান, পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ

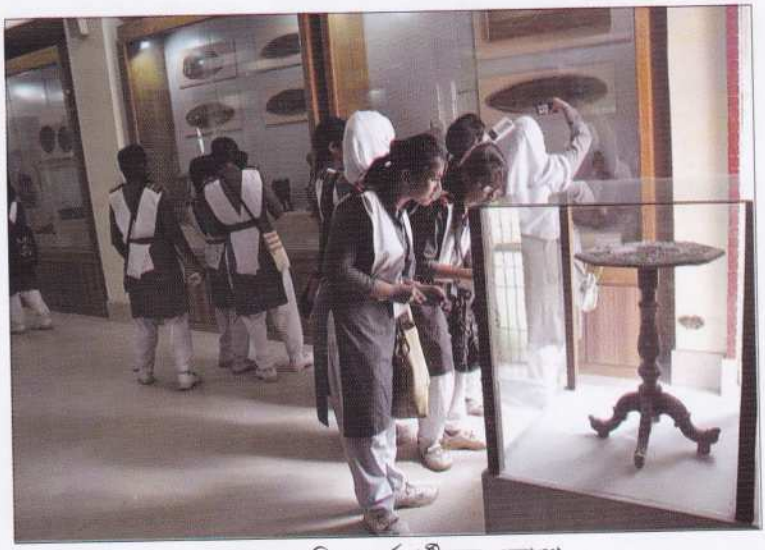

জাদুঘর গ্যালারিতে দর্শনার্থীদের একাংশ

গাজীরপট, প্রাপ্তিস্থান : ময়মনসিংহ, বিংশ শতাব্দী

পিতলের ঘোড়া

গ্যালারিতে প্রদর্শিত রূপার আতরদানি

পিতলের হাতি

গ্যালারিতে প্রদর্শিত পিতলের নির্দশন

জগ

থালা

ডুলা

কুলা

ঝাঁঝর

ফুলদানি

লোকজ উৎসবের বিশেষ আয়োজন লোকজীবন প্রদর্শনী

কোমরতাঁতে মণিপুরী ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর শিল্পী লক্ষ্মী রাণী সিনহা

লোকশিল্প জাদুঘর প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ ঐতিহাসিক যাত্রাপালা 'ঈশা খাঁ'

ফাউন্ডেশন পরির্দশনে আগত বিদেশি পর্যটক

ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি

সোনারগাঁয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজার বছরের প্রাচুর্যময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আলোচিত ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি সোনারগাঁও এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় গড়ে ওঠা অভিজাত আবাসিক ভবন ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রসহ ঔপনিবেসিক শাসনামলে বসবাসকারী অধিবাসীদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বাক্ষর বহন করে। ।

ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরশন কাজের ভিত্তিপ্রস্তরের ফলক উম্মোচন করেন তৎকালীন তথ্য মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ এমপি, সঙ্গে আছেন নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সাংসদ জনাব আব্দুল্লাহ-আল-কায়সার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, দক্ষিণ কোরিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত Lee Yun-Young. ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান মি. কিহাক সাং, কেইপিজেডের প্রেসিডেন্ট মি. জাহাঙ্গীর সাদাত, ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ, বড় সরদারবাড়ি রেস্টোরেশন প্রকল্পের পরিচালক স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম.আহমেদ, ব্যারিস্টার রফিকুল হক প্রমুখ

একই ভবনে চারটি সময়কালের স্থাপত্যশৈলী অবলোকন বাংলাদেশে এক বিরল ঘটনা। দেশের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি পর্যটকদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে সমাদৃত হবে বলে গভীর প্রতীতি।

বড় সরদারবাড়ি পুনরুদ্ধার প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সোনারগাঁয়ের প্রাণকেন্দ্রে বিখ্যাত বড় সরদারবাড়ি মুসলিম ঐতিহ্যিক স্থাপনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যার পরিচিতি বাংলার প্রতাপশালী শাসক ঈশা খাঁর বাড়ি হিসেবে। বার ভূঁইয়া, মুঘল আর ব্রিটিশ, সময় হিসেবে প্রায় ৬০০ বছর। বাংলার স্থাপত্যশৈলীর প্রায় সব নিদর্শন যেন একসাথে গাথা নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের এই বাড়িটিতে। সময়ের বিবর্তন আর নগর আগ্রাসনে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে যেতে বসেছিল ইতিহাসের এই ঐশ্বর্য। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকার সরদারবাড়িখ্যাত প্রাচীন ইমারতসহ ভূমি অধিগ্রহণ করে। আশির দশকের শেষদিকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কর্তৃক আংশিক সংস্কারের পর এটিতে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর গড়ে তোলা হয়। দীর্ঘদিন আলোচিত ভবনের সংস্কার কাজ করা হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন রাজধানীর স্মৃতি বিজড়িত বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শনে এর জীর্ণ দশা দেখে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের সাথে বড় সরদারবাড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে কথা বলেন। ০৩ জানুয়ারি ২০১২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান করপোরেশনের মধ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজের ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

রেস্টোরেশনের পূর্বে ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি

সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এককভাবে সবচেয়ে বড় বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কোরিয়া ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানী অনুদান হিসেবে ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও কোরিয়া ইপিজেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পপতি মি. কিহাক সাং বড় সরদারবাড়ি যথাযথ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে এর রাজসিকতা ফিরিয়ে আনতে অনন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। যা এদেশের মানুষের ঐতিহ্য, আভিজাত্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরবে। আলোচিত রেস্টোরেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভৌত অবকাঠামো ফিরিয়ে আনার পর এ ভবনের সম্মুখভাগে রাজকীয় জীবনধারাকে জীবন্ত করে তোলা হবে। আর এ বাড়ির পেছনের অংশে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হবে। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী ব্যতিক্রমী উদ্যোগের বিষয়ে জানতে চাইলে কোরিয়া ইপিজেডের প্রেসিডেন্ট মি.জাহাঙ্গীর সা'দাত বলেন,"আলোচিত রেস্টোরেশন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বড় সরদারবাড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা। বড় সরদারবাড়ির মত ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদটিকে তার প্রকৃতরূপ ফিরিয়ে দিতে তথা পুরাকীর্তি পুনরুদ্ধারে ইয়াংওয়ান কোম্পানির রেস্টোরেশন দৃষ্টান্ত (example) যদি অন্য মাল্টিনেশান কোম্পানি বা কর্পোরেট বডি পরিবর্তনের দ্বারা উপযোগী (adapt) করে দেশের একটা একটা হেরিটেজ সাইট That will be wandarful story for Bangladesh".

রেস্টোরেশনের পর ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি

বড় সরদারবাড়ি রেস্টোরেশন প্রজেক্টের পরিচালক এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান বিশিষ্ট স্থপতি অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ পুরোনো ভবনের রেস্টোরেশন কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "কথিত বড় সরদারবাড়ি ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের প্রাণকেন্দ্রে নির্মিত মধ্যযুগীয় উল্লেখযোগ্য একটি স্থাপনা। অনুপম স্থাপত্যশৈলীতে অলঙ্কৃত এই প্রাচীন স্থাপনাকে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে সংস্কার-সম্প্রসারণ কাজ সংঘটিত হয়। অনিন্দ্যসুন্দর অলঙ্করণশৈলীতে সুশোভিত বহুল আলোচিত ভবনটিতে তিনটি অংশ রয়েছে। ইমারতটির মূল অংশ মধ্যভাগ ঈশা খাঁর সময়ে অথবা প্রাক মুঘল আমলের। এটি প্রায় ৬০০ বছরের পুরোনো। ইমারতটির পেছনের অংশের নির্মাণ উপাদান, নির্মাণশৈলীর বৈশিষ্ট্য অবলোকনে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় এটিও মুঘল আমলের প্রথম দিকের কাজ। ভবনের অসংখ্য কক্ষের নমুনা, এর আকার আয়তন পরিদর্শনে বোঝা যায় এটি কোন আবাসিক ভবন ছিল না। মূলত ভবনটি ছিল বাণিজ্যিক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভবন। সম্ভবত ইমারতটি এতদাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হতো। অর্থাৎ একটি ভবনে প্রাক ইসলামী, প্রাক মুঘল, বার ভূঁইয়ার স্মৃতি ও ব্রিটিশ কলোনিয়াল স্মৃতি এই চারটি জেনারেশনের স্থাপত্যশিল্পের গুণাবলী আমার মনে হয় বাংলাদেশে খুব কম ভবনেই আছে"।

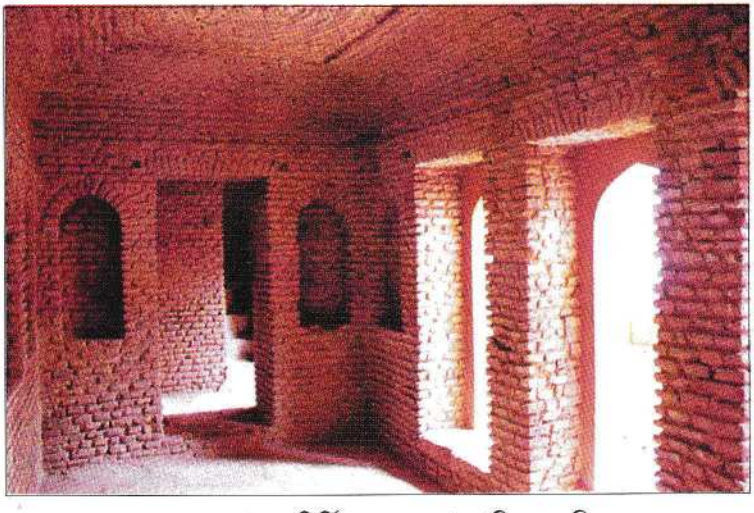

মুঘল আমলে নির্মিত বড় সরদারবাড়ির কুলঙ্গি

বড় সরদারবাড়ির বৈশিষ্ট্য

তথ্যানুসন্ধানে সরজমিন দেখা গেছে দ্বিতল বিশিষ্ট বড় সরদারবাড়ি দু'টি ভাগে গড়ে উঠেছে। দৃষ্টিনন্দন পুরোনো এ ইমারতটিতে দু'টি আঙিনা রয়েছে। লাল রঙের বর্গাকৃতির এই ভবন দু'টি ইমারতের মধ্যস্থলে নির্মিত। এ ইমারতটি প্রাচীন মুঘল আমলের অনুপম স্থাপত্যশৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। বিশেষত এটি বাংলার বার ভূঁইয়ার সময়ে গড়ে উঠেছে বলে অনুমিত হয়।

বড় সরদারবাড়ির মধ্যভাগের স্থাপত্যশৈলী

সরদার বাড়ির বর্তমান প্রধান ফটক একটি আর্কওয়ের ভেতর দিয়ে নির্মিত, যা অপেক্ষাকৃত নীচু ও চিন্নিটিকরি (চীনা মাটির সিরামিকের ভাঙা অংশ) দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। এই ইছাপাড়া ভবনের রাজকীয় সামনের অংশ রয়েছে পশ্চিমদিকের শান-বাঁধানো পুকুরের ধারে। এখানে দু'টি ঘোড়ার ওপর দু'জন অশ্বারোহী সুসজ্জিত সৈনিক সরদার বাড়ির শান-সৌকতের কালের স্বাক্ষী হয়ে এখনও দণ্ডায়মান। মূল্যবান এ স্মৃতি চিহ্নটি বাংলার প্রাচীন রাজধানীর পরিচিতি বহন করছে।

রেস্টোরেশনের আওতায় সংস্কার কাজের অংশ হিসেবে উচ্চ সজ্জার দেয়াল ও তল, ফ্লোরের ফিনিশিং কাজ, চিন্নিটিকরি সাজসজ্জা, কাঠের পাটাতনের নীচে লোহার পাত বা ভীমের প্রতিস্থাপন, পুরোনো রাজকীয় বাড়ির দরজা-জানালা সংযোজন, মূল ফটক, কাঁচের ছাদ, মেঝেতে মার্বেল পাথর স্থাপন, ভবনের পূর্ব ও পশ্চিমপাড়ের ঘাট সংস্কার, উন্নত

ড্রেনেজ সিস্টেম চালু এবং দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় যথাযথ গবেষণা করে রাজকীয় এ ভবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র প্রদর্শনের বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এক নজরে বড় সরদারবাড়ি

সরদার বাড়ির সম্মুখভাগ : প্রধান গেইট : ১টি, নীচতলায় বারান্দা: ৪টি, দ্বিতীয়তলা বারান্দা : ৩টি, নীচতলা বাইরের দিকে বারান্দা : ১টি, সিঁড়ি : ১টি, উন্মুক্ত প্যাভিলিয়ন : ১টি, নীচতলায় কক্ষ : ৭টি, দ্বিতীয়তলায় বারান্দা ১টি, কক্ষ : ৭টি, সম্মুখভাগে কক্ষসংখ্যা : ১৪টি।

বড় সরদারবাড়ির সম্মুখভাগের স্থাপত্যশৈলী

প্রাক মুঘল অংশ : নীচতলায় কক্ষ : ৯টি, দ্বিতীয়তলায় কক্ষ ৯ টি, প্রাক মুঘল অংশে কক্ষ সংখ্যা : ১৮টি, সিঁড়ি : ১টি, মূল ভবনের পূর্বদিকের বর্ধিতাংশে কক্ষ ২টি । প্যাভিলিয়ন ১টি। এটিকে একটি কিচেনেট ও কফিসপে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানে ভিভিআইপি ও ভিআইপি অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায়।

মুঘল অংশ : দ্বিতীয় অংশে বারান্দার সংখ্যা : ৪টি, উন্মুক্ত প্যাভিলিয়ন : ১টি, নীচতলা পূর্বদিকের কক্ষ সংখ্যা : ৮টি। নীচতলা পশ্চিমদিকে কক্ষ সংখ্যা : ৮টি, দ্বিতীয়তলায় পূর্বদিকে কক্ষ : ৮টি, দ্বিতীয়তলায় পশ্চিমদিকে কক্ষ : ৮টি, পূর্বদিকে সিঁড়ি : ১টি, পশ্চিমদিকে সিঁড়ি : ১টি, উত্তরদিকে সিঁড়ি : ১টি, উত্তরদিকে নীচতলার কক্ষ : ৯টি, উত্তরদিকে

দক্ষিণ কোরিয়া পার্লামেন্টের ৫জন মাননীয় সংসদ-সদস্যের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ি পরিদর্শন

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ॥ ১২ আশ্বিন ১৪২২ বঙ্গাব্দ প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়া এ্যামবাসির মান্যবর চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স Mr. Kwak Sam-ju - এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজ পরিদর্শন করেন কোরিয়ার জাতীয় সংসদ সদস্য 1. Mr.Kim Choon Jin, Chairman, Health and welfare Committee 2. Mr. Park Minsoo, Member Agriculture, Food, Rural Affairs, Occans and Fisheries committee 3. Mr.Choi Dong Ic, Member, Health and Welfare Committe, 4.Ms. Kim Sung Yeon , Secretary General of ICAPP, 5. Mr.Park Li Nam , Staff National assembly, কোরিয়া এ্যামবাসির দ্বিতীয় সচিব Ms. Welsoon kim এবং ইন্টারপ্রেটর সামসুল আলম ।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্দোক্তা ছিলেন কোরিয়া ইপিজেডের মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাবেক রাষ্ট্রদূত মি. জাহাঙ্গীর সা'দাত । ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ সম্মানিত অতিথিগণকে রেস্টোরেশন কাজের অগ্রগতি দেখাচ্ছেন । অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বড় সরদারবাড়ি রেস্টোরেশন প্রকল্পের স্থপতি মো. সারওয়ার হোসেন ।

দ্বিতীয়তলায় কক্ষ : ৯টি, দ্বিতীয় ভাগে মোট কক্ষ সংখ্যা : ৫০টি। দ্বিতীয় ভাগে সিঁড়ি : ৩টি, সম্প্রসারিত অংশ তৃতীয় ভাগে কক্ষের সংখ্যা ৩টি। উপরে ওঠার সিঁড়ির সংখ্যা ১টি, উন্মুক্ত কড়িডোর ১টি।

বহুল আলোচিত এই ভবনের মোট আয়তন ২৭ হাজার ৪০০ বর্গফুট। রেস্টোরেশন ড্রয়িং অনুযায়ী বড় সরদারবাড়িতে নীচতলায় কক্ষসংখ্যা ৪৭টি। দ্বিতীয়তলায় কক্ষসংখ্যা ৩৮টি। সর্বমোট কক্ষসংখ্যা ৮৫টি। বিভিন্ন উচ্চতার ছাদ ২৩টি। সিঁড়ি সংখ্যা ৬টি, লিফটের সংখ্যা ১টি, খড়খড়ি দরজা আনুমানিক ৪৯টি, খড়খড়ি জানালা (ছোট বড়) আনুমানিক ১৬৮টি, ফিক্সড্ কাচের জানালা আনুমানিক ১৮টি। সরদারবাড়ির পূর্বদিকে পুকুর আছে। এতে ৩টি শান-বাঁধানো ঘাট রয়েছে। পুকুরের পশ্চিমপাড়ের পুরো অংশ ইটের দেয়াল দ্বারা পাড় ভেঙ্গে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এ দিকেও ১টি পুকুর আছে। এতে ৩টি শান-বাঁধানো ঘাট আছে।

ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের স্মৃতিঋদ্ধ ইমারত

ড. সাঈদ আরো বলেন,"ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এসে আলোচ্য ভবনের তিনটি অংশকে একত্রিত করে সংস্কার সম্প্রসারণ কাজ পরিচালিত হয়। প্রায় ৬০০ বছরের পুরোনো ইছাপাড়া ভবনের মালিকানা পরিবর্তনের পর ভবন মালিকের ইচ্ছানুযায়ী কিছু অলঙ্করণ কাজ করা হয়েছে।" ঐতিহাসিক এই আবাসিক ইমারতের সম্মুখভাগের লিখন অনুযায়ী জানা যায় প্রধান ফটকে॥ সন ১৩০৮ সাল শ্রী শ্রী যুক্ত ওঁ গোপীনাথ জিউর॥ এবং সবশেষে ১৩৩০ সালে ভবনটির সংস্কার কাজ করা হয়েছে। এর প্রমাণ সংস্কার কাজ শেষে ভবনের দেয়ালে উৎকীর্ণ লিপিতে রয়েছে॥ শ্রী শ্রী যুক্ত গোপীনাথ জীউর শ্রী শ্রী চরণ ভরসা॥ সেবক বাশীনাথ সাহা সরদার সন ১৩৩০ সন ইছাপাড়া ভবন॥ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে দীর্ঘ দু'দশক জনসংযোগের দায়িত্ব পালনকালীন অভিজ্ঞতা, অগ্রজপ্রতিম ব্যক্তিবর্গের পর্যালোচিত অভিমত ও

আমার ধারণা ১৯০১ ও ১৯২৩ সালে ভবনটিতে সংস্কার কাজ শেষে সময় কাল লিখা হয়েছে।

প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়া'র ইয়াংওয়ান করপোরেশন কর্তৃক বড় সরদারবাড়ির রেস্টোরেশন কাজ সমাপ্তির পর এটি একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন হিসেবে প্রতিভাত হবে। বাংলার প্রাচীন রাজধানীর ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজের মায়াবী আকর্ষণে অনুসন্ধিৎসু দেশি-বিদেশি পর্যটক এই ভবনটিতে একই সাথে এদেশে বিদ্যমান প্রাক ইসলামী,মুঘল স্থাপত্য অলঙ্করণশৈলী, বার ভূঁইয়ার স্থাপত্য অলঙ্করণশৈলী, ব্রিটিশ কলোনিয়াল স্থাপত্যশৈলী এবং হিন্দু স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণে নির্মিত মনোলোভা স্থাপত্য নিদর্শনের জৌলুস পুনরায় অবলোকন করতে পারবেন। বাংলার প্রাচীন রাজধানীর ঐতিহ্যিক স্থাপত্যশৈলী পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে এর ভৌত অবকাঠামো ফিরিয়ে আনার পর রাজকীয় জীবন-ধারাকে মানসপটে উপস্থাপিত করা। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে Government of Bangladesh has taken the initiative to restore the heritage sites across the country. So that foreign tourists could be attracted to visit these sites in Bangladesh.

আলোচিত রেষ্টোরেশন কাজ সম্পর্কে ইয়াংওয়ান করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও কোরিয়া ইপিজেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পপতি মি. Kihak Sung বলেন, 'This project will involve substantial research and analysis to bring back the restoration work of the Baro Sardar Bari as much as possible to its original beauty and splendour.'

বড় সরদারবাড়ির আঙিনায় ভ্রমণ করলে মুঘল আমল থেকে ঔপনিবেশিক শাসনামলের অনুভূতি পাওয়া যাবে বলে গভীর প্রতীতি। সুলতানি আমলের পথ ধরে মুঘল আর সর্বশেষ ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক বড় সরদারবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন ঐশ্বর্যকান্ত সাহা সরদার বা বড় সরদার নামে একজন ব্যবসায়ী। তখন থেকেই এই ভবনটির পরিচিতি বড় সরদারবাড়ি হিসেবে। ভবনটি নির্মিত হয়েছে ছোট ছোট পাতলা জাফরি ইট, বারান্দা ঘেরা ওঠান, উপরে ত্রিভূজাকৃতির দেয়াল, নীচে অষ্টভূজ পিলারে। যার দেয়ালের পরতে পরতে সুক্ষ্ম কারুকাজ, চুনসুরকির আস্তরণে দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের স্বাক্ষী হয়ে। কালের বিবর্তনে ঐতিহ্যিক ভবনটির নাম বদলিয়ে এখন হয়েছে বড় সরদারবাড়ি।

রেস্টোরেশন সমাপ্তির পর এর মাধ্যমে আমাদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মেলবন্ধন সৃষ্টি হবে। একই সাথে প্রাচুর্যময় আভিজাত্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থানকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে উপস্থাপনের রাজসিক দ্বার উন্মুক্ত হবে।

বড় সরদারবাড়ির কড়িডোর নক্‌শার কাজ

প্রসঙ্গ ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা

সোনারগাঁ এবং ঈশা খান একে অপরের পরিপূরক। এর কিছুটা ইতিহাস, কিছু জনশ্রুতি এবং অবশিষ্ট অংশ এখনও ঐতিহাসিকদের কাছে বিস্ময় হয়ে আছে। ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুঘল সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসী ভূমিকার বিরুদ্ধে তিনি যে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তা তাঁকে স্মরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত করে। বার ভূঁইয়া প্রধান মসনদ-ই-আলা ঈশা খানের তিনটি রাজধানী ছিল। কাত্রাভু, সোনারগাঁও এবং জঙ্গলবাড়ি। এই তিনটি জায়গার মধ্যে সোনারগাঁও ছিল অন্যতম প্রধান রাজধানী।

ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা

ঈশা খাঁ ১৮ আগস্ট ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। "তাঁর পিতার নাম কালিদাস গজদানী, দেওয়ান সরকারের কাগজপত্র এবং তম্মতানুসারে ডাক্তার ওয়াইজের বিবরণের উক্ত হইতেছে

যে, কালিদাস গজদানী সমসাময়িক মুসলমান নরপতির সভাসহ অমাত্যের ধর্ম্মব্যাখার ফলে ইসলাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।" ১৫

'পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য কুতুবউদ্দীন খাঁ তাকে লালন পালন করেন। দাদার মৃত্যুর পর ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরাইলে আগমণ করেন। ৩৫ বছর বয়সে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কররাণী শাসকদের সামন্তরূপে সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগণায় ভিনদেশি হিসেবে তিনগুণ মোহর প্রদানের বিনিময়ে জামিদারী লাভ করেন। দাউদ খানের প্রতি কর্তব্য পালনের প্রতিদানে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মসনদ-ই-আলা উপাধি লাভ করেন। রাজা টোডরমলের সময় ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সব পরগণা ক্রয়ের মাধ্যমে বারো ভূঁইয়াদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদীর জমিদারীকে সাফল্যের সাথে এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁর রাজ্য বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ বা কুমিল্লা জেলার অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। সম্ভবত বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলার কিছু অংশেও তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরাইলে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেন এবং ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে সরাইল থেকে সোনারগাঁয় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিশোরগঞ্জের জঙ্গল বাড়িতেও তিনি অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেন। ঈশা খাঁ শ্রীপুর (বিক্রমপুর) রাজ্যের রাজা চাঁদ রায়ের কন্যা এবং কেদার রায়ের বোন স্বর্ণময়ীকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে তার নাম হয় সোনা বিবি। মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহকে পরাজিত করে ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। বাংলার স্বাধীনতার বীজ তিনি বপন করেছিলেন। তাঁর সাহস, সমরকৌশল, নেতৃত্ব ও যোগ্যতা, বীরত্ব, দেশপ্রেম প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি দীর্ঘ ৫৩ বছর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। মহেশ্বরদী পরগণার বক্তারপুর দুর্গে যাওয়ার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।' উক্ত তথ্যসহ গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানার বক্তারপুর গ্রামে তাঁর সমাধি রয়েছে বলে ঈশা খাঁ ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা যায়।

ঈশা খাঁর জঙ্গলবাড়ির একাংশ, ছবি : সংগৃহীত

এছাড়া মো. রফিকুল হক আখন্দ 'মার্জুবানে ভাটি' ঈসা খাঁর স্বাধীনতার লড়াই শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন 'মুঘল সম্রাট জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহন করেন। তাঁর শাসনকালে ভারতের প্রায় সকল সুবার বিস্তীর্ণ এলাকা শাসনাধীনে এলেও সুবা বাংলার সম্পূর্ণ অংশ করায়ত্ব হয়নি। সে সময় সুবা বাংলায় বারো জনেরও অধিক ভূস্বামী প্রায় স্বাধীন সামন্ত শাসক হিসেবে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করতেন। এই জমিদার শ্রেণি ইতিহাসে 'বারোভূঁইয়া' নামে খ্যাত ছিলেন। ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা ছিলেন এই জমিদারদের নেতা। তিনি সোনারগাঁও থেকে জঙ্গলবাড়ি, সরাইল থেকে রংপুর পর্যন্ত শাসন করতেন।

ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা ছিলেন ভাটিরাজ্যের অধিপতি। আকবরের মন্ত্রী ও লেখক আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আকবরনামা'য় ঈসা খাঁকে 'মার্জুবানে ভাটি' বা ভাটির শাসক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ভাটি বলতে আবুল ফজলের আইন-ই আকবরীতে সুবে বাংলার পুর্বাঞ্চলকে নির্দেশ করা হয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিংহের পূর্বাংশ এবং ত্রিপুরা-সিলেটের পশ্চিমাংশ নিয়ে এই ভাটিরাজ্য গঠিত ছিল। উত্তর-পশ্চিমে ঘোড়াঘাট-রংপুর, শেরপুর বগুড়াও ঈসা খাঁর এই ভাটিরাজ্য বিস্তৃত ছিল। ঈশা খাঁ স্বীয় যোগ্যতা এবং দুরদর্শী ও দুঃসাহসী বিজয় অভিযানের ফলে ২২টি পরগণার মালিক হয়েছিলেন। বিশাল ভাটিরাজ্যের অধিপতি হয়েও তিনি স্থানীয় ঐতিহাসিকদের চোখে জমিদার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

ভারত সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট আকবরের সভাসদ, মন্ত্রী আবুল ফজলের চোখে 'মার্জুবানে ভাটি' বা ভাটির রাজা হিসেবে এবং ইউরোপীয় পরিব্রাজক রালফ্ ফিচের বর্ণনায় 'বাংলার রাজাদের রাজা' হিসেবে ঈসা খাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে।' [১৬]

কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে ঈশা খাঁর নির্মিত মসজিদ

ঐতিহাসিক আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরীতে ঈসা খাঁকে স্বাধীন নৃপতি উল্লেখ করে লিখেছেন, Isa khan, Zamindar of Bhati spent his time in dissimulation .... Isa acquired fame by his ripe

গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার বক্তারপুর গ্রামে ঈশা খাঁর সমাধি
ছবি : সংগৃহীত

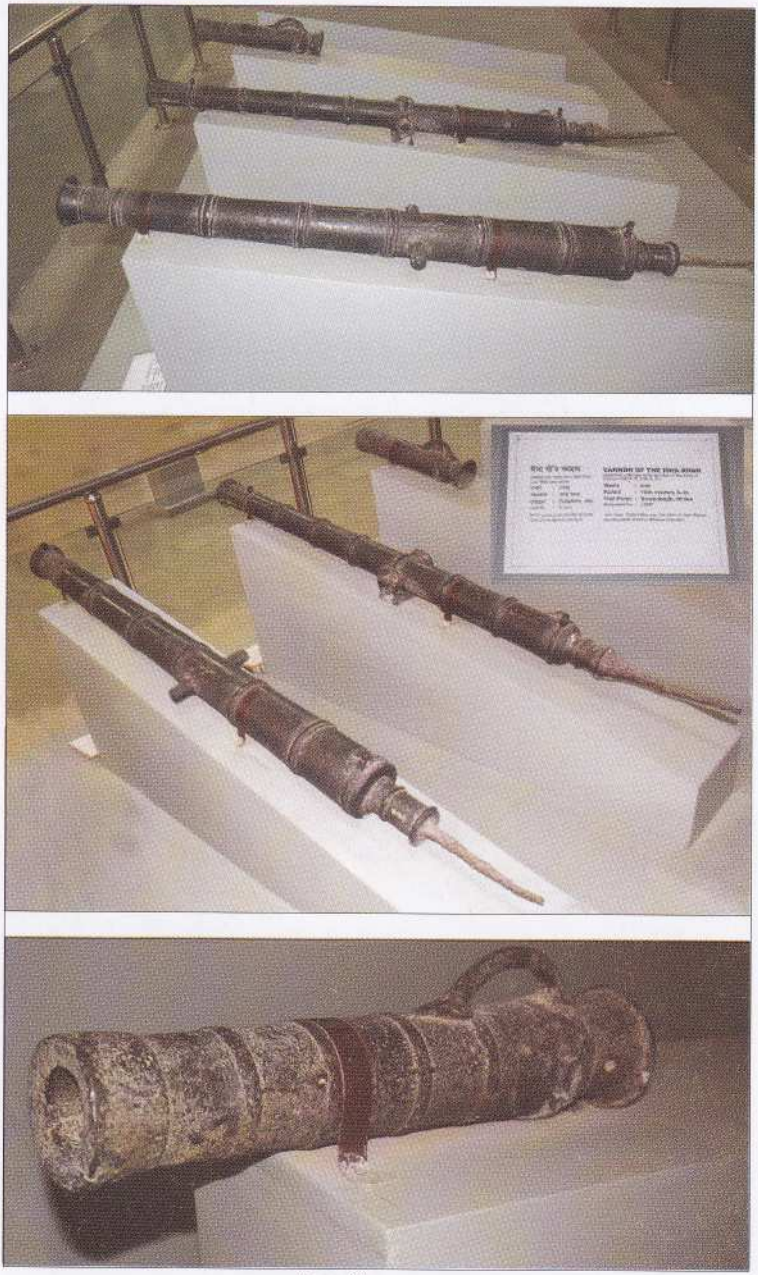

ঈশা খাঁর কামান

সৌজন্যে : জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ

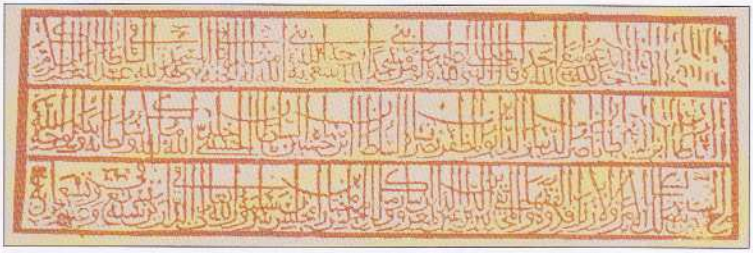

নুসরত শাহ'র সোনারগাঁও শিলালিপি ৯২৯ হিজরি

কষ্টিপাথরের ওপর লেখা শিলালিপি সুলতানি আমলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সোনারগাঁয়ের সোনালি ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে এটি।

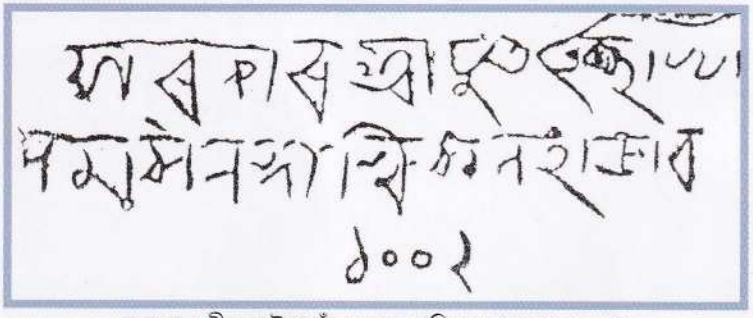

সরকার শ্রীযুক্ত ইছা খাঁন মসনদ্দালি সন হাজার ১০০২

উল্লেখ্য ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারি ভাষা ছিল ফারসি এবং তখন হিজরি সন ব্যবহৃত হত। ঈশা খাঁনের কামানে প্রথম বাংলা লেখা তার বিদ্রোহী মনের পরিচয় বহন করে।

মহেন্দ্রদেব ও রাজা দনুজমর্দন নাম অঙ্কৃত মুদ্রার প্রতিলিপি

judgment and deliberateness and made the 12 Zamindar of Bengal subjec to himself. Out of foresiht and cautiousness, he refrained from waiting upon th ruler of Bengal, Though he rendered servic to them and sent them presents. From a distance, he made use of submissive language. (Akbarnamah, III, p. 647).

ঈসা খাঁর সোনারগাঁয়ের সম্পর্কের বিষয়ে রালফ্ ফিচ লিখেছেন, They be all here about rebels against their king Zebaldin Echeber (Jalaluddin Akbar). For here are so many rivers and islands the they flee from one to another ... whereby his hore men cannot prevail against them ... Sinnergan (Sonargaon) is a town six leagues (ie. 18 miles) from Serrepore (sripur)... The chef king of all these countries is called Isacan (Isa Khan and he is chief of all other king (journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta 1904, p61).

খাসনগর দিঘি

বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে অনেক জলাশয়। এর কোনো না কোনোটি প্রায় হাজার বছরের পুরোনো। অনেক দিঘির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে সভ্যতার ইতিহাস। এসব দিঘির রয়েছে জানা-অজানা কাহিনী। খাসনগর দিঘি দিঘিরপাড় মহল্লায় অবস্থিত এক সুবিশাল দিঘি। এখানে তৈরি হতো জগদ্বিখ্যাত মসলিন কাপড়। পৃথিবীর বিখ্যাত মসলিন তৈরির নগরী হিসেবে সোনারগাঁয়ে অত্যন্ত অভিজ্ঞ পেশাদার মসলিন তাঁতিদের একটা বড় আবাসস্থল ছিল এটি। পলিমাটি দ্বারা তৈরি এই দিঘির পানি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ছিল। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতের পূর্বে প্রাকৃতিক ভাবে দিঘির পানিতে মসলিনের সূতা ধুয়ে নেয়া হতো এটিকে সূক্ষ্ম ও মসৃণ করার জন্য। এ দিঘির পাড় মহল্লায় প্রায় ১৫ শত মসলিন তাঁতি পরিবার বসবাস করতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। তাছাড়া 'আইন-ই-আকবরী'তে 'খাসনগর দিঘি' নামে সোনারগাঁয়ের এক ইতিহাস বিখ্যাত দিঘির কথা বিবৃত হয়েছে। পানাম সিটির প্রায় দেড় কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত এ দিঘির ওপর টেইলর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ঐতিহাসিক খাসনগর দিঘির বর্তমান রূপ

দিঘিটি বর্তমানে পূর্বের আদলে না থাকলেও ধারণা করা হয় যে, এতে প্রাকৃতিক নিয়মে রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকায় তা মসলিন ধোয়ার জন্য খুবই উপযোগী ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিরা বাংলার এই মসলিনকে চিরতরে ধ্বংস করেছে। পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্ঠিকারী এই বয়ন কারুশিল্পের ঠাঁই ইতিহাসের অধ্যায়ে। বয়ন কারুশিল্পের এই ঐতিহ্যবাহী আকর্ষণ মসলিন কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেলেও সোনারগাঁয়ের বয়ন কারুশিল্পীরা জামদানি শাড়িকে ধরে রেখেছেন।

মসলিন

মসলিন শব্দটির উৎপত্তি ও মসলিন নামকরণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এটি ফারসি সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ নয়। তবে সবচেয়ে সুক্ষ্ম মিহি সুতায় তৈরি বস্ত্রকে মসলিন নামে অভিহিত করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন ইরাকের প্রাচীন ব্যবসাকেন্দ্র মসুল থেকে মসলিন শব্দটির উৎপত্তি। কারও কারও মতে দক্ষিণ ভারতে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানির একসময়কার সদর দপ্তর মসলিপট্টমের সঙ্গে মসলিন শব্দটির যোগসাজশ রয়েছে। আবার অনেকের মতে, ইউরোপীয়রা মুসল থেকে যে সব বস্ত্র আমদানি করতো এবং প্রাচ্যের মুসল হয়ে যে সব বস্ত্র আসতো তাকেই বলা হতো মসলিন। বিভিন্ন লেখকের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, ঢাকাই মসলিন এতটাই স্বচ্ছ ছিল যে ভেজা অবস্থায় এটি ও ভোরের শিশিরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যেতো না। তাঁতিদের অসাধারণ নৈপুণ্যে তৈরি

মসলিন এতটা সূক্ষ্ম ও হালকা ছিল যে তা একটি আংটির ভেতর দিয়ে প্রবেশ করানো যেতো।

একসময়কার ঐতিহ্যবাহী ঢাকাই মসলিন সম্পর্কে বলা হতো, এটি স্বর্গের অপ্সরীদের নিপুণ হাতে চাঁদের সুতোয় বোনা। এই বস্ত্রের জন্য ঢাকার খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। মসলিন এতোই সূক্ষ্ম, চমৎকার ও উৎকৃষ্ট ছিল যে তা 'ভোরের শিশির', 'প্রবাহমান জলধারা', ' হাওয়ার ইন্দ্রজাল' ইত্যাদি নানা নামে আখ্যায়িত হতো। সূক্ষ্ম বুনন, অতুলনীয় স্বচ্ছতা ও দক্ষ কারুকার্যের জন্য মসলিন সারাবিশ্বের সর্বাপ্রেক্ষা উৎকৃষ্টমানের বস্ত্র ছিল। ঢাকাই মসলিনের শ্রেষ্ঠত্যের কাছে হার মেনেছিল ব্রিটেনের উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি সূক্ষ্মতম বস্ত্রও।

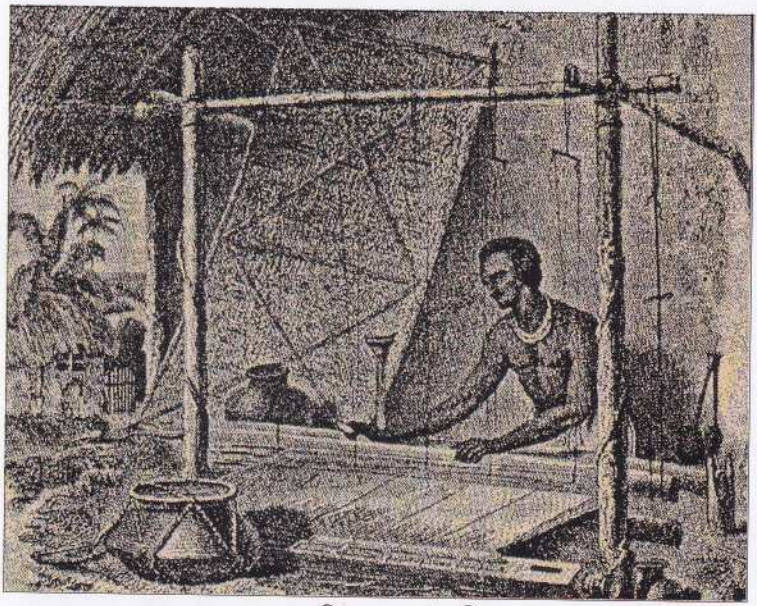

মসলিনের বুননশৈলী

ঐতিহ্যগতভাবে মসলিন উৎপাদনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে সুপরিচিত ছিল সোনারগাঁও। ঢাকা, সোনারগাঁও, ধামরাই, তিতাবদী, জঙ্গলবাড়ি, বাজিতপুর ইত্যাদি সমৃদ্ধশালী অঞ্চলসহ পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী-বেষ্টিত বিরাট লোকালয় জুড়ে ছিল মসলিন উৎপাদনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধতম এলাকা। সুতরাং শুধু উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবেই নয়, স্মরণাতীতকাল থেকে মসলিন রফতানি কেন্দ্র হিসেবেও সোনারগাঁও সমৃদ্ধি অর্জন করে আসছে।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় যে, প্রাচীন মিশরের মমিগুলো ছিল এদেশ থেকে আমদানিকৃত মসলিনে আবৃত এবং নীলরঙে রঞ্জিত। বার্ডউডের মতে, প্রাচীন গ্রিস ও রোমের মতো আসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়া মসলিন বস্ত্রের সাথে পরিচিত ছিল এবং সে সব দেশে এ বস্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। রয়েলি উল্লেখ করেন যে, 'খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রিকগণ মসলিন বস্ত্র ব্যবহার করতো। একইভাবে রোম সাম্রাজ্যে মসলিন ছিল খুবই লোভনীয় জিনিস।' উরের ভাষায়, 'ঢাকার মসলিন হয়ে উঠেছিল সেরিয়া দ্য ভেস্তা' (Seria de veste) যা রোমের অভিজাত ও শৌখিন রাজকীয় মহিলাদের কাছে বহুআকাঙ্ক্ষিত বস্ত্র ছিল।' প্লিনির ভাষায়, 'রোমের মহিলারা এত পাতলা কাপড় পরতো যে তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করাই কঠিন ছিল। রোমের মহিলারা সোনা বা রূপার সুতার কাজ করা কাশিদা নামক এক ধরনের মসলিনের ব্যবহার নিয়ে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো।'

A woman in Dhaka clad in fine Bengali muslin, 18th-centu
Wikipedia : Commons has media related to Muslin dresses.

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর ঐতিহাসিক ইবনে খুরদাদ-বে-এর মতো অনেক আরব ঐতিহাসিকদের রচনায়ও সবচেয়ে মনোরম ও বিশ্বখ্যাত মসলিনের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। মার্কো পোলোও এরকম

নিখুঁতভাবে বয়নকৃত বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় ১৪ টাকায় ১৫ গজ লম্বা সবচেয়ে নিখুঁত সুতিবস্ত্র বিক্রয়ের যে কথা জানা যায় তা নিঃসন্দেহে ছিল মসলিন বস্ত্র। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের দরবারে আসা মান্যবর চীনা রাষ্ট্রদূতগণ মসলিনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁরা ছয় ধরনের মসলিনের পরিচয় দিয়ে সেগুলোকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন

* পি পো, এমন ধরনের বস্ত্র, যা ছিল দু থেকে তিন ফুট চওড়া ও পঞ্চাশ থেকে ষাট ইঞ্চি লম্বা এবং বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত খুবই সূক্ষ্ম ও মসৃণ;
* মান-চে-তি, মনোরম হলুদ রঙের বস্ত্র, চওড়ায় চার ফুট বা তারও বেশি আর লম্বায় পঞ্চাশ ফুট। এটি ছিল খুবই আঁটসাটভাবে বয়নকৃত এবং মজবুত ধরনের;
* শাহ-না-কিয়েহ, তিন ফুট চওড়া ও ষাট ফুট লম্বা আরেক ধরনের মসলিন, চীনা লোপুর সাথে যার সাদৃশ্য রয়েছে;
* হিন-পেই-তাং-তা-লি, মোটা ধরনের মসলিন, তিন ফুট চওড়া ও ষাট ফুট লম্বা;
* শা-তা-এউল, এটি ছিল দু'রকম মাপের, একটি পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ও পঞ্চাশ ফুট লম্বা এবং অপরটি আড়াই ফুট চওড়া ও চার ফুট লম্বা। চীনা 'সান সো'র সাথে এর খুবই সাদৃশ্য রয়েছে;
* মা-হেই-মা-লী লমল লম্বায় বিশ ফুট বা ততোধিক ও চওড়ায় চার ফুট পরিমাপে তৈরি। এর দু'পাশে রয়েছে চার বা পাঁচ-দশমাংশ পুরু আচ্ছাদন এবং এটি দেখতে অনেকটা চীন 'তাওলোকীনে'র মতো।

ইউরোপীয় পর্যটকদের মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করার পূর্বেই চতুর্দশ শতাব্দীতে কবি আমীর খসরু লিখেছেন, 'এটি এত সূক্ষ্ম ও হালকা ছিল যে একশ'গজ মসলিন সহজেই মাথার চারদিকে পেঁচানো যেত এবং তার পরেও চুলের রেশ দেখা যেত।' তিনি আরও বলেন যে, 'এই সূক্ষ্মতম বস্ত্রের একটি টুকরো সহজেই নখের ভিতরে ধারণ করে রাখা সম্ভব, যদিও খোলা অবস্থায় ছড়িয়ে দিলে তা সারাটি জগৎ ঢেকে দিতে পারে।' মসলিনের প্রতি বাংলার জনগণের রোমাঞ্চকর অনুভূতির মূলে রয়েছে এর নরম তুলতুলে জমিন, মনোরম সৌন্দর্য এবং শিল্পনৈপুণ্য। ইউরোপীয় পর্যটকগণ প্রথম যখন এসব বস্ত্র দেখল তখন তারা তাদের বিশ্বাস করতে পারল না এবং ভাবল এগুলো যেন 'বাতাসের সুতোর পরীদের হাতে বোনা।' উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্বে মসলিনের

সমাদর ও চাহিদাবৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন রকম বুনন এবং বঙ্গের মসলিন প্রস্তুতের হার বেড়ে যায়। ভারথেমা ১৫০৩-১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে মসলিন বস্ত্রকে বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, যেমন বইরাম, ন্যামোনে, লিজাতী, ক্যাইন্‌তার দউয়ার, ও সিনাবাফ। বারবোসা ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলায় খুবই উন্নত ধরনের সুতা উৎপাদনের গাছ জন্মাতে দেখেন। তাঁর ভাষায়, 'তারা বিভিন্ন ধরনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মনোরম বস্ত্র প্রস্তুত করে; রঙিন বস্ত্র নিজেদের ব্যবহারের জন্য আর সাদা বস্ত্র বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রয়ের জন্য। এসব বস্ত্র খুবই মূল্যবান। তাছাড়া 'এস্ত্রাভানতিস' (estravantes) নামে পরিচিত কিছু সূক্ষ্ম বস্ত্র মহিলাদের মাথার ওড়না হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মূর, আরব ও পারসিকরা পাগড়ি হিসেবে ব্যবহারের জন্য এ ধরনের বস্ত্রের খুবই সমাদর করে থাকে।'

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে মসলিন শিল্পের মান ও সৌকর্য বিদ্যমান ছিল। আবুল ফজলের ভাষায়, 'সরকার সোনারগাঁয়ে খুবই সূক্ষ্ম এক জাতের মসলিন বিপুল পরিমাণ উৎপাদন করে থাকে।' এটি 'মলমল খাস' নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। সুন্দরভাবে পালিশ করা, সোনা বা রূপার সুতায় পুষ্প নকশা আঁকা নারকেলের খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে মলমল খাসকে প্যাকেট করা হতো। ঢাকার মসলিন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে রপ্তানি হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মসলিন তখন প্রস্তুত হতো; যেমন কাশিদা, তানজেব, বাফতা, আজীজোল্লাহ, দুরিয়া, জামদানি, ভিটি, চারখানা, আবরোয়ন, ঝুনা, সরবতী, শাবনাম ইত্যাদি।

কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা থেকেই মসলিনের অসাধারণ সূক্ষ্মতা ও নিখুঁত নকশার কথা অনুমান করা যায়। যেমন এক পাউন্ড সুতা ১৬০ মাইল পর্যন্ত বিস্তার করা যেত; মসলিনের একটি ছোট্ট দলা দুই ফার্লং ষাট গজ পর্যন্ত টেনে লম্বা করা যেত; ২০ হাতের এক থান মসলিন ফুঁ দিয়ে ফুরফুর করে ওড়ানো যেত; এক টুকরা শাবনাম ঘাসের উপর পড়ে থাকলে অত্যধিক স্বচ্ছতার কারণে দেখাই যেত না বলে একে শাবনাম বা সকালের শিশির বলা হয়ে থাকে। আবরোয়ানের নাম আবরোয়ান বা বহমান পানি হয়েছে এজন্য যে, যদি তা পানির উপর ফেলা হতো তবে তা স্বচ্ছতার জন্য চোখে বোঝাই যেত না। সম্রাট আওরঙ্গজেব জামদানি খুবই পছন্দ করতেন। একবার তাঁর কন্যা জেবুন্নেসা সাত প্যাঁচ দিয়ে মসলিন পরে তাঁর সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে অশালীনতার জন্য ভর্ৎসনা করেন।

মসলিন উৎপাদনের নগরী হিসেবে সোনারগাঁয়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূল কারণ হচ্ছে এখানে মসলিন শিল্পীদের এক বিরাট উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এ শিল্পকর্মে তাদের পেশাগত দক্ষতা ছিল। সোনারগাঁও অঞ্চল, বিশেষ করে কাপাসিয়া এলাকায় মসলিন বস্ত্র উৎপাদনের কথা জানা যায়। এ অঞ্চলটি সূক্ষ্মতম কার্পাস তুলা ব্যাপক চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। বিশেষ ধরনের কার্পাস তুলা থেকে মসলিন শাবনাম ও আবরোয়ান দক্ষ তাঁতিদের হাতে বোনা হতো।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সোনারগাঁও অঞ্চলে মসলিনের বুনন ও এর ব্যবসার চরম উন্নতি সাধিত হয়। মিশ্র অনুভূতি নিয়ে টেইলর বলেছেন : 'এমনকি বর্তমানকালে যদিও বয়নশিল্পের ব্যাপক পূর্ণতা সাধিত হয়েছে তথাপি স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য ও বুননের চমৎকারিত্বে মসলিন বস্ত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিশ্বের যে কোনো দেশের তাঁতশিল্পের সর্বোত্তম উৎপন্ন দ্রব্যকেও তা হার মানিয়ে দেয়।'

জনৈক আঞ্চলিক ঐতিহাসিক লিখেছেন, মসলিনের ক্রয় বিক্রয় অতি প্রাচীন কাল হতে সুবর্ণগ্রামেই সম্পন্ন হতো। সঙ্গত কারণেই বলা যায়, আজকের সোনারগাঁও অতি প্রাচীন কাল থেকেই মসলিনের জন্য বিখ্যাত ছিলো। অতি প্রাচীন বন্দর হিসেবেও সোনারগাঁয়ের খ্যাতি ছিল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত থাকলেও একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন, গঙ্গে বন্দর সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রামের স্বন্নিকটেই অবস্থিত ছিল।

কৌটিল্য খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তার অর্থ শাস্ত্রের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ অধ্যায়ে বলেছেন যে, বঙ্গের তৈরি দু'কুল (সুক্ষ্ম বস্ত্র) শুভ্র ও মসৃন। সুতরাং বুঝা যায়, গঙ্গের সংস্কৃতি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও ছিল। অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে বঙ্গের যে খ্যাতি, তা প্রধানতঃ সুক্ষ্ম বস্ত্র মসলিনকে কেন্দ্র করে। আর উন্নত মসলিন তৈরির কার্পাস উৎপন্ন হতো সোনারগাঁও বা ঢাকা অঞ্চলে।

উল্লেখ্য যে, বাংলার উৎপন্ন কার্পাস তুলা মসলিন তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। ইংরেজরা বাংলাদেশে তাদের কল-কারখানায় সাধারণ কাপড় তৈরির জন্য সুরাট ও মীর্জাপুর থেকে সুতা আমদানি করতো। মসলিন প্রস্তুতের জন্য সুরাটের সুতা উপযোগী ছিল না।

হিউয়েন সাঙ ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে যখন এ দেশে আসেন, তখন এ দেশে কলিঙ্গ, কর্ণ সুবর্ণ, পৌণ্ড্র বর্ধন, তাম্রলিপ্তি ও সমতট এই পাঁচটি মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। এখানে উল্লিখিত কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) কর্ণ সুবর্ণ (রাঢ়) পৌণ্ড্রবর্ধন (গৌড়), তাম্রলিপ্তি (সুক্ষ্ম) বাদে যে মণ্ডলটি থাকে তার নাম

সমতট। পৌণ্ড্রবর্ধন উত্তর বাংলার দিকেও নির্দেশিত হয়। তাহলে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার জন্য একটি নামই প্রযোজ্য যার নাম সমতট। অন্তত হিউয়েন সাঙের সময়ে তাই ছিল। আমাদের আলোচিত সোনারগাঁওকে সমতটে ছাড়া আর চারটি স্থানের কোন একটিতেও স্থান দেয়া যায় না। হিউয়েন সাঙের সময় অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সোনারগাঁও সমতটের অর্ন্তভূক্ত ছিল। সোনারগাঁও নামটি খুব বেশি প্রাচীন নয়, নামটি বেরিয়ে এসেছে সুবর্ণগ্রাম থেকে। পূর্বেই বলা হয়েছে, জনৈক আঞ্চলিক ঐতিহাসিক সুবর্ণগ্রামকে 'প্রাচীন স্থান' বলেছেন। কিন্তু কত প্রাচীন তা বলেন নি। খ্রিস্টপূর্ব ১৪৬২ সালে মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের সমাপ্তিকালে অধিকাংশ মমী মসলিনে আবৃত্ত থাকতো। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, বাংলাদেশ মসলিনের জন্মস্থান। এবং কাপাসিয়া, সোনারগাঁও, ঢাকা মসলিন বয়নের প্রাচীনতম কেন্দ্র। উৎকৃষ্ট মসলিন বয়নের কেন্দ্র হিসেবে সোনারগাঁও, ঢাকা, জঙ্গলবাড়ি কাপাসিয়া প্রভৃতি স্থানকে নির্দেশ করা হয়। তাহলে বলতে দ্বিধা নেই, সোনারগাঁও প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের প্রাচীন জনপদ। কারণ মিশরের খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর পূর্বের মমীতে মসলিন জড়ানো থাকতো। সে মসলিন সোনারগাঁও বা সোনারগাঁও অঞ্চলের বলেই মনে হয়। কারণ উৎকৃষ্ট মসলিন সোনারগাঁও বা সোনারগাঁও অঞ্চলের বলেই কাপাসিয়া, ঢাকা, বাজিতপুর, কাঁচপুর, জঙ্গলবাড়ি, সিদ্ধিরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে উৎপাদিত হতো। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার এক কবিতায় বলেছিলেন, বাংলার মসলিন/বোগদাদ রোম চীন/কঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন। তা কতদিন আগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তা উল্লেখ করেননি। কবিতায় তা সম্ভবও নয়। কারণ কবিতা ও ইতিহাস এক নয়। পদ্মা, মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্র বেষ্টিত১,৯৬০ বর্গমাইল স্থান জুড়ে চমৎকার মসলিন তৈরি হতো। একথা ঐতিহাসিক সত্য। মেগাস্থিনিস (আ. ৩০২ খ্রিস্টপূর্ব) এর লেখায় মসলিনের প্রসঙ্গ আছে– একথাও ঐতিহাসিক সত্য, প্লিনির লেখায় মসলিনের প্রসঙ্গ আছে তাও ঐতিহাসিক সত্য।

সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে মসলিনকে আরবি শব্দ বলা হয়েছে। মসলিন অর্থ অতি মিহি ও মসৃন কার্পাস বস্ত্র, বিশেষ। কিন্তু মসলিন আরবি শব্দ নয়। Perso Arabic Element in Begali, A Mussalmani Bengali English Dictionary তে মসলিন শব্দ নেই। উইলিয়াম কেরীর : Dictionary of Bengali Language এ ও মসলিন নেই। Samsad Bengali English Dictionary তে মসলিন অর্থ : A very fine and

soft cotton fabric, muslin. Samsad English-Bengali Dictionary তে muslin অর্থ : delicatey woven cotton fabric মসলিন কাপড় (F. mousseline<it. Mussolino= the town of mousl) অর্থাৎ ইতালীয় Mussolino শব্দ থেকে ফরাসি Mussoline শব্দটি এসেছে। পরে শব্দটি ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। ইংরেজ শাসনকালে এই সুক্ষ্ম বস্ত্রের (কার্পাস বস্ত্র) নামকরণ হয় মসলিন নামে।

জেমস টেলর বলেছেন, "ঢাকা অঞ্চলে উৎকৃষ্টতম কার্পাস উৎপন্ন হয় এবং আমি বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন হয় না। ভারতের অন্য কোন অঞ্চলের অথবা মারিটনিয়া দ্বীপপুঞ্জের অথবা বোর্বনের সেখানের কার্পাসের খ্যাতি আছে এবং আমি যতটুকু খবর রাখি পৃথিবীর কোন স্থানের কার্পাস ঢাকা অঞ্চলের উৎপন্ন কার্পাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে না এবং গুণের ভিত্তিতে সমকক্ষ হতে পারে না।" ইংরেজ রেসিডেন্ট জে, বেব্ব লিখেছেন যে, বাংলার সুতা বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলের সুতা সমগ্র পৃথিবীর যে কোন সুতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। এবং এ থেকে আশ্চর্য রকমের সুক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্র উৎপাদকরা ভেবেছিলেন যে, সুরাটের সুতাই সর্বোৎকৃষ্টমানের। কার্যতঃ সুরাট ও উত্তরাঞ্চলীয় সুতা সুক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র তৈরির জন্য অনুপযোগী ছিল। এই মসলিন বস্ত্র উপরোল্লিখিত অঞ্চলে চাষকৃত ফটি নামে অভিহিত একমাত্র বাংলার সুতার সাহায্যেই তৈরি হতো।

বাংলার মসলিন জগৎ বিখ্যাত ছিল। এই সূক্ষ্ম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা, এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে মসলিন বিদেশে রপ্তানি হতো ইরাক, আরব, ব্রহ্মদেশ, মালাক্কা ও সুমাত্রায় বাংলার কাপড় রপ্তানি হতো। ইউরোপে খুব সুক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল। এটা এমন সুক্ষ্ম হতো যে ২০ গজ মসলিন নস্যের ডিবায় ভরে নেয়া যেত। মসলিনের বয়ন কৌশল ইউরোপে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছিল।"

ঐতিহাসিক বার্ণিয়ার মন্তব্য করেন যে "চাল-চিনি ছাড়াও আরও অনেক মূল্যবান পণ্য সামগ্রী আছে যা বিদেশি বণিকদের এদেশে আকৃষ্ট করে। যেমন, এখানে এত তুলা ও রেশম উৎপন্ন হয় যে বাংলা রাজ্যকে এই দু'টি দ্রব্যের একটি প্রকাণ্ড গুদাম ঘর বলা যেতে পারে। এবং এই গুদাম ঘর আখ্যাটি যে আপেক্ষিকভাবে শুধু হিন্দুস্থান বা মহান মুঘল সাম্রাজ্যের বেলায়ই খাঁটে তা নয়, সমগ্র ইউরোপের বেলায়ও এই কথা প্রযোজ্য। তুলা ও রেশম বস্ত্রের রং এর বৈচিত্র্য শিল্পনৈপুণ্য, রকমারিত্ব ও পরিমাণের বিশালতা দেখে বার্ণিয়ার বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর কথায় সব রকমের সাদা রঙিন সুক্ষা মোটা প্রভৃতি বস্ত্রের বৈচিত্র্য ও পরিমাণের

বিপুলতা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। মসলিন কাপড় ওলন্দাজেরা বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে জাপানে ও ইউরোপে রপ্তানি করে থাকে। ওলন্দাজ ছাড়া ইংরেজ পুর্তগীজ ও দেশীয় সওদাগরেরাও বড় রকমের ব্যবসা করে থাকে।"

"খ্রিস্ট জন্মের পূর্ব থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত মসলিনের খ্যাতি ছিল অব্যাহত। বয়ন শিল্পে ব্যবহৃত উপকরণসহ উৎখননে প্রাপ্ত আরও অনেক প্রাচীন সভ্যতার নির্দশনের সূত্র ধরে অনেকেই বঙ্গজনের ইতিহাসকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পিছনে নিয়ে গেছেন। মানব সভ্যতার প্রাচীন আবাস স্থল ক্রীট দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্যক যোগাযোগ ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ ঘটনা প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বের বলে মনে করা হয়। তুলা বা কার্পাসের জন্য শ্রেষ্ঠ অঞ্চল ছিল সোনারগাঁও অঞ্চল। কাজেই সোনারগাঁও প্রায় সাড়ে তিন অথবা তিন হাজার বছরের প্রাচীন জনপদ। মহাভারতের ভীম লাঙ্গল বন্দে এসেছিলেন বলে অনেকেই মনে করেন [সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস, স্বরূপ চন্দ্র রায়]।" লাঙ্গল অষ্ট্রিক শব্দ। কাজেই শব্দটি আর্যপূর্ব যুগের। আর্যরা সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে এসেছিলো। মহাভারতের অনেক পণ্ডিত (যেমন ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়) প্রায় তিন হাজার বছরের প্রাচীন বলে উল্লেখ করেছেন। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে নারায়ণগঞ্জ শহরের বয়স প্রায় সোয়া দু'শ বছর হলেও এ জেলার একটি উপজেলা সোনারগাঁও (লাঙ্গল বন্দ এ উপজেলায়) প্রায় তিন হাজার বছরের প্রাচীন জনপদ।

ইংরেজদের মেশিনে তৈরি সুতার আমদানি মসলিন শিল্পকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলে। বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়ে এবং তাঁতিদেরকে নির্যাতন করে এ শিল্পের সমাধি রচনা করতে ইংরেজ শাসকদের কোনো দ্বিধা হয়নি। বলা হয়ে থাকে যে, সূক্ষ্মতম বস্ত্রের বুননে বাংলায় যেসব তাঁতি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী কেটে ফেলতেও তারা কোনো দ্বিধা করেনি।

মুঘল বাদশা, নবাব ও পদস্থ কর্মকর্তাদের পৃষ্টপোষকতার অভাবে মসলিন শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসতে শুরু করে। পলাশী যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একক আধিপত্য বিস্তার করে। ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানি ও বিদেশি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। এতে মসলিন রপ্তানি-বাণিজ্যে ধস নেমে আসে। এ ছাড়া ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ও আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিস্কারের ফলে পোশাক শিল্পে আসে ব্যাপক

পারিবর্তন। মসলিন তার বাজার হারাতে শুরু করে। ইংল্যান্ডের শিল্পকারখানায় উৎপাদিত সস্তা মূল্যের বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি তাঁতিদের বোনা ঐতিহ্যবাহী মসলিন।

জামদানি

জামদানি নামের উৎপত্তি নিয়ে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায়নি। অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ এর মতে 'ফারসি' শব্দ জামা মানে কাপড় 'দানা' অর্থ বুটি অর্থাৎ জামদানি অর্থ বুটিদার কাপড়। অপভ্রংশ হিসেবে এটি জামদানি হতে পারে। ফারসিতে 'জাম' এক প্রকার উৎকৃষ্ট মদের নাম আর 'দানি' অর্থ পেয়ালা এ শব্দদ্বয় থেকে জামদানি নামের উৎপত্তি অথবা জাম পরিবেশনকারী ইরানী সাকীর কোমল অংগ স্পর্শ করে ঢাকার বুটি তোলা মসলিন হয়তো একদা জামদানি নাম ধারণ করেছিল। আমাদের দেশে মোগল আমলে ইরানী প্রভাবে জামদানির জন্ম বলে অনুমিত হয়। প্রাচীনকালে তাঁত বুনন প্রক্রিয়ায় কার্পাস তুলার সুতা দিয়ে মসলিন নামে সুক্ষ্ম মিহি বস্ত্র তৈরি করা হতো এবং মসলিনের উপর যে জ্যামিতিক বুটিদার বস্ত্র বোনা হতো তার নাম জামদানি।'[১৭] মসলিনের পরিপূরক হয়ে বাংলায় জামদানি এসেছে বলে আমার ধারণা। এদেশের তাঁতিদের নিপুণ দক্ষতায় তৈরি জামদানি আপন মহিমায় মসলিনের মতোই আভিজাত্যে এখনও অম্লান।

ইতিহাসবিদের বর্ণনায় জামদানির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়, আনুমানিক ৩০০ খ্রিস্টাব্দে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে, পেরিপ্লাস অব দ্য এরিথ্রিয়ান সি গ্রন্থে এবং বিভিন্ন আরব, চীন ও ইতালীর পর্যটক ও ব্যবসায়ীর বর্ণনাতে। কৌটিল্যের গ্রন্থে বঙ্গ ও পুণ্ড্র এলাকায় সূক্ষ্ম বস্ত্রের উল্লেখ আছে, যার মধ্যে ছিল ক্ষৌম, দুকূল, পত্রোর্ণ ও কার্পাস।

নবম শতাব্দীতে আরব ভূগোলবিদ সোলায়মান তার গ্রন্থ সিল সিলাই-উত-তাওয়ারিখে রুমি নামের রাজ্যে সূক্ষ্ম সুতি কাপড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার বর্ণনা অনুসারে বোঝা যায়, রুমি রাজ্যটি আসলে বর্তমানের বাংলাদেশ। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং সোনারগাঁও এলাকার সুতিবস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বিখ্যাত পর্যটক রালফ ফিচ ও ঐতিহাসিক আবুল ফজলও ঢাকার মসলিনের প্রশংসা করেছেন।

আরেক ঐতিহাসিক জেমস্ টেইলর জামদানির বর্ণনায় বলেছেন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১০*২ হাত মাপের ও ৫ শিক্কা ওজনের একটুকরা আব-ই-রওয়ান এর দাম ছিল ৪০০ টাকা। সম্রাট

আওরঙ্গজেবের জন্য তৈরি জামদানির দাম ছিল ২৫০ টাকা। ১৭৭৬ সাল পর্যন্ত ঢাকায় সবচেয়ে উৎকৃষ্টমানের জামদানির মূল্য ছিল ৪৫০ টাকা।

সোনারগাঁয়ের খিদিরপুর গ্রামে কর্মরত জামদানি শিল্পীদের সাথে কথা বলছেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপ

ঐতিহাসিক বর্ণনা, শ্লোকগাথা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় দুকূল বস্ত্র থেকে মসলিন এবং মসলিনে নকশা করে জামদানি কাপড় তৈরি করা হত। মূলত বাংলাদেশের ঢাকা জেলাতেই মসলিন চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ঢাকা জেলার সোনারগাঁও, ধামরাই, তিতাবাড়ি, বাজিতপুর, জঙ্গলবাড়ি প্রভৃতি এলাকা মসলিনের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইউরোপীয়, ইরানী, আর্মেনিয়ান, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি বণিকেরা মসলিন ও জামদানি ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। এ কারণে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানগণও জামদানি শিল্প বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

ঢাকাই মসলিনের স্বর্ণযুগ বলা হয় মুঘল আমলকে। এ সময় দেশে-বিদেশে মসলিন, জামদানির চাহিদা বাড়তে থাকে এবং শিল্পেরও ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। আঠারো শতকে ইংরেজ দলিল থেকে জানা যায় মলমল খাস ও সরকার-ই-আলি নামের মসলিন সংগ্রহ করার জন্য দারোগা-ই-মলমল পদবীর উচ্চ পর্যায়ের রাজ কর্মচারি নিযুক্ত ছিলেন। প্রতিটি তাঁতখানায় একটি দপ্তর ছিল এবং এখানে দক্ষ তাঁতি, নারদিয়া, রিপুকার প্রভৃতি কারিগরদের নিবন্ধন রাখা হত। সে সময় দারোগার প্রধান কাজ ছিল মসলিন ও জামদানি তৈরির বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর লক্ষ রাখা। তৎকালীন সময়ে ঢাকা থেকে প্রায় একলক্ষ টাকা মূল্যমানের মলমল-খাস মুঘল দরবারে রপ্তানি করা হত।

১৭৪৭ সালের হিসেব অনুযায়ী দিল্লির সম্রাট, বাংলার নবাব ও জগৎ শেঠের জন্য প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার জামদানি ক্রয় করা হয়। এছাড়া ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ প্রায় নয় লাখ টাকার মসলিন ক্রয় করেন। তবে আঠারো শতাব্দীর শেষের দিকে মসলিন রপ্তানি অনেকাংশে হ্রাস পায় ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে। এদের নিযুক্ত গোমস্তারা নিজেদের স্বার্থে তাঁতিদের উপর নির্যাতন শুরু করে। তাঁতিরা কম মূল্যে কাপড় বিক্রি করতে রাজী না হলে তাদের মারধোর করা হতো।

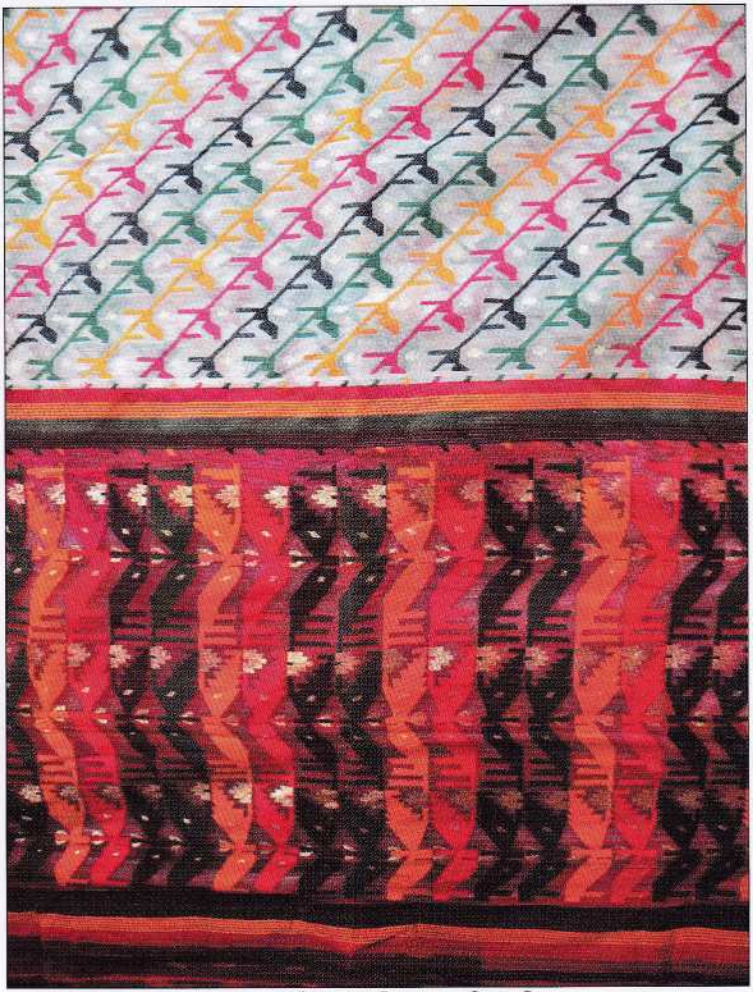

সোনারগাঁয়ে তৈরি জামদানি শাড়ি

উনিশ শতকের মাঝামাঝি জামদানি ও মসলিনের এক হিসেব থেকে দেখা যায় সাদা জমিনে ফুল করা কাজের ৫০,০০০ টাকার জামদানি দিল্লি লক্ষ্মৌ নেপাল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি এলাকার নবাবরা ব্যবহার করতেন। এই শিল্প সংকুচিত এবং পরে বিলুপ্ত হওয়ার পেছনে কিছু কারণ ছিল, যার মধ্যে প্রধান কারণ ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব। এর ফলে বস্ত্রশিল্পে যন্ত্রের আগমন ঘটে এবং কম মূল্যে ছাপার কাপড় উৎপাদন শুরু হয়। এছাড়া দেশি সূতার চেয়ে তখন বিলেতি সূতার দাম কন ছিল। তৎকালীন মুঘল সম্রাট ও তাদের রাজ কর্মচারিরা এ শিল্পের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন।

বর্তমানে জামদানি তার নিজস্ব মোটিফের নান্দনিক সুষমায় গৌরবান্বিত। জামদানি শিল্পের উন্নয়নে তাঁতি সম্প্রদায় ও উদ্যোক্তাদের আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। নিজস্ব মোটিফ ও তাদের বয়ন কৌশলে হাতে বোনা কাপড় আজও বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়ে আসছে। জামদানি শিল্পের নান্দনিক মর্যাদায় বয়ন নকশা এবং অসাধারণ নিপুণতা বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের এক উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

জামদানি বুননে কারিগরি দক্ষতার চেয়ে শৈল্পিক দক্ষতা ও নৈপুণ্য বেশি জরুরি। জামদানির বয়ন কৌশল স্মৃতি নির্ভর। যেটি ওস্তাদ-শাগরেদের পারিবারিক ও দীর্ঘদিনের গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মাধ্যমে নকশার গাণিতিক নিয়ম তাঁতিদের মেধায় সংরক্ষিত থাকে। এই পদ্ধতিতে ওস্তাদ শাগরেদকে বলতে থাকে আর শাগরেদ তা থেকেই বুঝতে পারে যে ওস্তাদ কোন নকশাটি তুলতে যাচ্ছেন। তাদের নিজস্ব বুলি জামদানির নকশা তৈরির ফর্মুলা বিশেষ। কারিগর নিপুণ দক্ষতার সাথে আঙুলের মাধ্যমে ভরনার সুতাকে টানা সুতার মধ্য দিয়ে চালনা করে জামদানিতে নকশা ফুটিয়ে তোলেন। জামদানির বুননশৈলী একে করে তুলেছে অনন্য। জামদানির মূল আকর্ষণ এর বাহারি মোটিফ। সংক্ষেপে বলা যায় জামদানি এমন একটি শিল্প যেখানে যান্ত্রিক কর্মকাণ্ড একেবারেই নেই। এ শিল্পের মূলে রয়েছে অভিজ্ঞতা, দক্ষশিল্পীর শ্রম, মেধা, মননশীলতা, ধৈর্য, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি।

জামদানির দাম নির্ভর করে শাড়ির বুননশৈলী এবং সুতার কাউন্টের ওপর। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ এবং সোনারগাঁও এলাকার অসংখ্য গ্রামে বাহারি নক্শায় জামদানি তৈরি হয়। সরজমিন জামদানি পল্লি পরিদর্শনে গিয়ে তাঁতিদের সাথে কথা বলে জানা যায় পরিবেশ আর প্রকৃতির প্রভাবেই এই অঞ্চল জামদানি শিল্পের জন্য

প্রসিদ্ধ। শীতলক্ষ্যা নদীর দু'পাড়ে নোয়াপাড়া-তারাব পৌরসভা ও ডেমরাতে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে পরদিন শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত জামদানি বিকিকিনির হাট বসে। জামদানি শিল্প এখন একান্তই বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ। এটি ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্বঐতিহ্যের অংশ হিসেবে সমাদৃত। জামদানি তার নিজস্ব মোটিফের নান্দনিক সুষমায় গৌরবান্বিত।

গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড

সম্রাট শের শাহ ১৬শ শতকে প্রশাসনিক ও ঘোড়ার ডাক প্রচলনের সুবিধার্থে পাঞ্জাব থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত সড়ক-ই-আজম নামক রাজপথ তৈরি করেছিলেন। ইতিহাসখ্যাত এ রাজপথের নাম গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড। জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, 'শের শাহ্ দুষ্কৃতিকারীদের মনে এমন ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন যে, তাঁর আমলে মানুষ রাত্রিকালে নির্ভয়ে রাজপথে ঘুমাত। তিনি সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু মহানদ পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন। এই রাজপথের দৈর্ঘ্য তিন হাজার মাইল। এর প্রতি কুড়ি মাইল পর একটি করে সরাইখানা এবং এক ক্রোশের ব্যবধানে একটি করে কূপের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাস্তার পাশে বহু মসজিদও তৈরি করা হয়েছিল। পথচারিদের ছায়াদান এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে তিনি পথিপার্শ্বে বৃক্ষরাজি রোপন করেছিলেন'।

গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড ছবি : সংগৃহীত

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক নির্মাণ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক কাজে গতি সৃষ্টি করা। এ ছাড়া, প্রতিরক্ষার কৌশলগত দিক সামনে রেখে সমগ্র সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানও এর লক্ষ্য ছিল। এর মাধ্যমে রাজধানী আগ্রার সঙ্গে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলকে যুক্ত করা হয়েছিল। মূল পরিকল্পনায় রাজধানী আগ্রাকে পূর্বে সোনারগাঁও, পশ্চিমে দিল্লি ও লাহোর হয়ে মূলতান, দক্ষিণে বোরহানপুর এবং দক্ষিণপশ্চিমে যোধপুরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। সামরিক সুবিধার পাশাপাশি বাণিজ্যিক উন্নতি, ডাক-যোগাযোগে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সে সঙ্গে কঠোর গুপ্তচর প্রথার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের তথ্যাদি সংগ্রহ করাও সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল।

ব্রিটিশ আমলে সৈন্য চলাচলের সুবিধা এবং ডাক বিভাগের উন্নতির উদ্দেশ্যে সড়কটির সংস্কার করে কলকাতা থেকে পেশওয়ার পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। এ সময়ই সড়কটির নাম দেওয়া হয় গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড।

পিঠাওয়ালির পুল

সোনারগাঁ কাজী ফজলুল হক ইউমেন্স কলেজ-এর প্রধান ফটকের সম্মুখে পিঠাওয়ালির পুল অবস্থিত। সম্রাট শের শাহের সময়ে বা ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে পিঠাওয়ালির পুল নির্মিত হয়। অথবা ঈশা খানের রাজত্বের শেষ দিকে এবং ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়ার দিকে এ সেতুর পত্তন হয়। সেতুটি অভ্যন্তরীণ চলাচলের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হতো। এটি চারশত বছরের প্রাচীন নিদর্শন বলে ধারণা করা হয়।

পিঠাওয়ালির পুল

বিজয়ের স্মৃতি

আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় এবং বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। সোনারগাঁও অঞ্চলের বীর শহীদদের স্মরণে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক পিঠাওয়ালির পুলের সম্মুখে বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। এ স্মৃতিতে উৎকীর্ণ শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের নামের তালিকা নিম্নরূপ :

মুক্তিযুদ্ধের বিজয়স্তম্ভ, সোনারগাঁও

১. শহীদ মোমিন ভূঁইয়া ২. শহীদ আঃ মজিদ ৩. শহীদ রমজান আলী ৪. শহীদ শামসুজ্জামান মজনু ৫. শহীদ নূর হোসেন ৬. শহীদ আক্তার হোসেন ৭. শহীদ নূরুল ইসলাম ৮. শহীদ আলতাফ হোসেন ৯. শহীদ তোফাজ্জল হোসেন ১০. শহীদ আঃ মালেক ১১. শহীদ মোস্তফা মিয়া ১২. শহীদ আলী আকবর ১৩. শহীদ আব্দুল মালেক ১৪. শহীদ বদরুজ্জামান ১৫. শহীদ আফাজ উদ্দিন ১৬. শহীদ সিদ্দিক মিয়া ১৭. শহীদ মাহবুব আলম।

বাড়িমজলিশ জামে মসজিদ

বাড়িমজলিশ জামে মসজিদটি ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন মোগপাড়া চোরাস্তার আধা কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। মসজিদের পশ্চিমে একটি ঈদগাহ ময়দান তৈরি করা হয়েছে। মসজিদের মূল গম্বুজে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় সুজাউদ্দৌলা যখন বাংলার দিওয়ান ছিলেন তখন ১১০২ হিজরিতে এটি নির্মিত হয়। বিভিন্ন সময়ে আলোচিত মসজিদের সংস্কার সম্প্রসারণ কাজ করা হয়েছে।

বাড়িমজলিশ মসজিদে উৎকীর্ণ শিলালিপি

মোগরাপাড়া

মোগরাপাড়া ও পানাম সিটি প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁয়ের কেন্দ্রভূমি ছিল বলে ধারণা করা হয়। মোগরাপাড়া ও পানামের ইতিহাস কত প্রাচীন এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মতামত উপস্থাপন করেছেন। ফলে পানাম, মোগরাপাড়ার প্রাচীনত্বের সাঠিক সময়কাল উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। মোগরাপাড়া ও পানাম সিটির অবস্থান এর ভৌগোলিক পরিবেশ বিবেচনায় ধারণা করা হয় এ অঞ্চলের ইতিহাসের বয়স পেরিয়ে গেছে হাজার বছর।

এ সুবর্ণভূমির কোন অঞ্চলকে ঘিরে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এবং কি কারণে প্রাচীন সুলতান, রাজা বা সামন্তপ্রভুরা মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র নদী বিধৌত এ দ্বীপাঞ্চলকে বেছেনিয়েছিলেন এবং সোনারগাঁয়ের রাজধানী, নগর, বন্দরের পরিধি কতটুকু ছিল তাও গবেষণার বিষয়।

নদী বিধৌত প্রাকৃতিক সুরক্ষা ও উর্বর পললভূমির আধিক্যের কারণে সোনারগাঁও অঞ্চল কৃষিজাত পণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্যের কারণে প্রাচীনকাল থেকেই সোনারগাঁও অঞ্চলের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন, মাহুয়ান ও রালফ্ ফিচের বর্ণনানুসারে প্রতীয়মান হয় যে, কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও রফতানির জন্য সোনারগাঁও নৌবন্দরের সুনাম উপমহাদেশ থেকে বর্হিবিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সুবাদে একটি ঐশ্বর্যশালী এবং ধণাঢ্য শ্রেণির বসতি গড়ে উঠেছিল পানাম, মোগরাপাড়া অঞ্চলকে ঘিরে। এয়োদশ শতাব্দীতে (১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ) ইবনে বতুতা সোনারগাঁও পরিভ্রমণ করেন। তিনি সোনারগাঁও বন্দরে ইন্দোনেশিয়ার জাভাগামী সামুদ্রিক জাহাজ দেখেছিলেন, এজন্য বলা যায়, মোগরাপাড়া, উদ্ধবগঞ্জ, বৈদ্যেরবাজার, কোম্পানিগঞ্জ, কাবিলগঞ্জকে ঘিরে সোনারগাঁও নদী বন্দরের অভ্যুদয় ঘটেছিল। মোগরাপাড়ার সম্মুখে মেনিখালি নদী যে প্রাচীন বড় একটি নদীর খণ্ডাংশ তা মোগরাপাড়ার দক্ষিণ পাশের ভৌগোলিক পরিবেশ অবলোকনে বোঝা যায়। এছাড়া মোগরাপাড়া দরগাবাড়িতে প্রাপ্ত শিবলিঙ্গ, মন্দিরস্তম্ভ এবং খিলানের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যায়।

মোগরাপাড়ার পাশে ইফসুফগঞ্জ মসজিদের পেছনের এক ভিটিবাড়ি সংলগ্ন পুকুর খননকালে প্রাচীনঘাট, পাথরের শিবলিঙ্গ ও কয়েকটি প্রস্তরস্তম্ভ পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, মোগরাপাড়ায় হিন্দু রাজাদের বাস ভবনের অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীতে মোগরাপাড়ায় হিন্দু রাজাদের রাজধানীতেই হয়তোবা মুসলিম সুলতানরাও তাদের রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন।

মোগরাপাড়া দরগাশরীফের পাশে মোগরাপাড়া স্কুলটি গোলাবাড়ি গ্রাম হিসেবে পরিচিত। সম্ভবত এ গোলবাড়ি গ্রাম রাজধানী সোনরগাঁয়ের রাজস্ব হিসেবে সংগৃহীত শস্যভাণ্ডারের গোলাঘর হিসেবে চিহ্নিত ছিল। গোলাবাড়ির ঐতিহাসিক নামটি মোগরাপাড়াকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। ১৮ বিঘা আয়তনের মোগরা পাড়া দরগাবাড়িটি প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁয়ের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এ দরগাবাড়ির ভেতরে ৪টি পুকুর, বাড়ির চারদিকে পরিখাবেষ্টিত খাল, এর সাথে সংযুক্ত মোগরাপাড়ার পেছনের উত্তরদিকের শহর সোনারগাঁয়ের প্রাচীন খাল,

পশ্চিমদিকে দমদমা দুর্গ সম্বলিত গ্রামের বড়শহরের খালের সাথে যুক্ত হয়েছে। দরগাবাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাড়িটির যে প্রান্তেই খনন করা হোকনা কেন সেখানেই প্রাচীন দেয়াল বা কোঠার অস্তিত্ব রয়েছে বলে প্রবীণ লোকদের মুখে শোনা যায়।

মোগরাপাড়ার অভ্যর্থনা কেন্দ্র নহবত খানাটি এখনো সুলতানি আমলের ইমারত হিসেবে টিকে আছে। দরগাবাড়ির শাহীমসজিদটি জালালুদ্দিন ফতেশাহের আমলে নির্মিত এক অনন্য কীর্তি। জালালুদ্দিন ফতেশাহ'র আমলের মোকাররমউদ্দৌলা কর্তৃক এটি নির্মিত। যিনি ফতেশাহ'র রাজপোশাক রক্ষক, ইকলিম মোয়াজ্জমাবাদ ও সিলেটের লাউর অঞ্চলের প্রশাসক ও সোনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি আলোচিত মসজিদটি ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে নিমার্ণ করেন। মোগরাপাড়া দরগাবাড়ি কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে রাজকীয় এ মসজিদে সুলতানগণ হয়তো নামাজ আদায় করতেন। দরগাবাড়ি কমপ্লেক্স পরিদর্শনে গিয়ে সুলতানি আমলে রাজসিকতা দেখতে না পেলেও এক সময় এটি যে প্রাচীন রাজধানীর সোনালি ইতিহাস, ঐতিহ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এখানে ঘুমিয়ে আছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ-ইতিহাসঐতিহ্য। সুলতানি বাংলার দরগাবাড়ি কমপ্লেক্সের সমাধিসৌধ গুলো এবং এখানে প্রাপ্ত পাথর খণ্ড আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় তাঁরা একদা মহৎসাধক ছিলেন জন্য দীর্ঘ ৬০০ বছর পরেও বিনম্র শ্রদ্ধায় তাঁদের স্মরণ করা হয়। এজন্যই বলা হয়েছে শোনহে মানুষ ভাই, সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দরগাবাড়ি বা মোগরাপাড়ায় বাংলার প্রাচীন রাজধানীর ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না।

মোগরাপাড়া দরগাবাড়ি কমপ্লেক্সের পাশে রয়েছে আন্ধারকোঠা নামে সুলতানি আমলে নির্মিত ৬০০ বছরের জীর্ণ ভগ্ন প্রাসাদ। পণ্ডিতদের ধারণা সুলতানি আমলের চুন-সুরকির গাঁথুনিতে পাতলা জাফরি ইটের নির্মিত এ প্রাসাদের বয়স ৬০০ বছর বা তারও বেশি হতে পারে। এ ভবনের মাটির নিচে একটি কুঠুরির অস্তিত্ব এখনো টিকে আছে। ধর্মবিশ্বাসীরা পবিত্র জ্ঞানে এখানে ধ্যানে বসতেন। অন্য একটি সূত্র উল্লেখ করে যে, সুলতানি আমলের কারাগার অথবা পীর ফকিরদের ধ্যানে বসার জন্য এ কুঠুরিটি নির্মিত হতে পারে। মোগরাপাড়ার সুপ্রাচীন ইসলামী একাডেমির ভবন এখানেই ছিল। ভগ্নপ্রায় ভূগর্ভস্থ প্রার্থনা

কক্ষের পাশে রয়েছে শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা নির্মিতএকাডেমির একটি কুলঙ্গি সম্বলিত ইমারতের ধ্বংসাবশেষ। দিল্লির শাসক গিয়াসুদ্দিন বলবনের সময় উপমহাদেশ খ্যাত ইসলামী পণ্ডিত শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা ১২৭৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি থেকে সোনারগাঁয়ে আসেন। তিনি এখানে সুবর্ণগ্রামের শাসক হিসেবে রাজা রায় দনুজের সাক্ষাৎ পান। সম্ভবত গিয়াসুদ্দিন বলবনের বিজয়ী হবার পর সোনারগাঁও অঞ্চল বলবনি সুলতানের অধীনে আসে।

সুলতানি আমলে নির্মিত ভূগর্ভস্থ প্রার্থনা কক্ষ, মোগরাপাড়া

এই মোগরাপাড়ায় রয়েছে ১৩শ শতকে সোনারগাঁয়ে শুভাগমনকারী শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা এর সমাধি, ইব্রাহীম দানিশমান্দের সমাধি, শেখ মুহাম্মদ ইফসুফ এবং শেখ মাহমুদের সমাধি।

সোনারগাঁয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বিশেষত সুলতানি আমলে বাংলার প্রাচীন রাজধানীর খোঁজ পেতে হলে দেশি-বিদেশি পর্যটকগণকে এই মোগরাপাড়ায় যেতে হবে। যেখানে রয়েছে হাজার ছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য। মধ্যযুগের প্রত্নস্থল মোগরাপাড়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সুলতানি বাংলার নিদর্শন বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনিত।

নহবতখানা

প্রত্যেহ সকাল-সন্ধ্যায় রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির দ্বারে বিশেষ বাদ্যধ্বনি করার জন্য গোলাকার বড় ঢোলক বিশেষ হলো নওবত। আর খানা- যে স্থানে বা যে মঞ্চে বসে নওবত বাজানো হয়। আলোচ্য নওবতখানা মোগরাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে মাজারের পার্শ্বে একটি ভগ্নপ্রায় প্রাচীন ইমারত। এটিকে প্রাসাদের তোরণ বা নহবতখানা বলা হয়ে থাকে। এখানে বাদ্যযন্ত্র সহকারে সকাল-সন্ধ্যায় মুসাফিরদের নিকস্থ আশ্রয়ের সন্ধান দেয়া হতো বলে অধ্যাপক এএইচ দানী উল্লেখ করেছেন। মুসলিম শাসনামলে রাজপুরুষদের প্রাসাদের সম্মুখে নহবতখানা থাকতো। যেখানে প্রত্যুষে বাদ্যযন্ত্র বাজাবার রেওয়াজ ছিল বলে জানা যায়। সরজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় নহবতখানার বাইরে সাম্প্রতিক সময়ে একটি গেইট নির্মাণ করা হয়েছে।

সুলতানি আমলে নির্মিত নহবতখানা, মোগরাপাড়া

দরগাবাড়ি কমপ্লেক্স

মোগরাপাড়াস্থ নহবতখানা সংলগ্ন সমাধি সৌধ অঙ্গনের মধ্যযুগীয় মর্মস্পর্শী অনুভূতি জাগানো কমপ্লেক্সই দরগাবাড়ি হিসেবে পরিচিত। চারদিকে প্রাচীর পরিবেষ্টিত অঙ্গনে নাম না জানা অসংখ্য পাকা কবরসহ তিনটি সমাধি সৌধ রয়েছে। পশ্চিম দিকে ইব্রাহিম দানিশমান্দ সমাধি সৌধ, মধ্যভাগে শেখ মুহাম্মদ ইউসুফ এবং পূর্ব দিকে তাঁরপুত্র শেখ মাহমুদ এর সমাধি সৌধ। S.M. Taifoor gives the name of the for persons buried in this Complex Ibrahim Danishmand, Shah Muhammad Ahle llm, Syed Mugammad Yusuf and his oife Ayesha Banu.

যাহোক মোগরাপাড়া দরগা শরীফে রয়েছে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ) এর সমাধি এবং নাম না জানা অসংখ্য সমাধি, প্রাচীন পুকুর, শান বাঁধানো ঘাট, পাথরের শিলালিপি, টেরাকোটা নিদর্শন, এর জামেয়া, মানাশাহ দরবেশে সমাধি সৌধ। আলোচিত দরগাবাড়ির উত্তর দিকে মধ্যযুগীয় একটি মসজিদ রয়েছে। এর পূর্ব দিকে দেয়ালঘেরা সমাধি ক্ষেত্রে এক সারিতে ৬টি পাকা কবর আছে। এ সমাধি ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে একটি পুকুর রয়েছে। এই পুকুর, দরগাবাড়ি এবং মসজিদের মধ্যভাগে উন্মুক্ত জায়গা রয়েছে।

মোগরাপাড়া দরগাবাড়ি অঙ্গনে প্রস্তরখণ্ড

মোগরাপাড়া ফতে শাহের মসজিদ

সুলতান জালাল উদ্দিন ফতোশাহ'র সময়ে মোগরাপাড়াতে এ মসজিটি নির্মিত হয়। শিলালিপি থেকে জানা যায় ১১১২ হিজরি মোতাবেক ১৭০০-০১ খ্রিস্টাব্দে আলোচ্য মসজিদটির সংস্কার কাজ করা হয়েছে। এই পুরানো মসজিদের পিছনের বাগানে মুঘল আমলে তৈরি কয়েকটি বাড়ির ধ্বংস্তুপ রয়েছে। জনশ্রুতি আছে সুলতানি আমলে এখানে ধনাগার ছিল। এটি হয়তো মাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে।

এ মসজিদের প্রবেশ পথের দেয়ালে কালবর্ণের পাথর ছিল। তাতে চুনের প্রলেপ দিলে হারানো জিনিস পাওয়া যায়। এরূপ বিশ্বাস থেকে লোকেরা প্রলেপ দিত। ফলে সেখানে চুন জমে যায়। পরবর্তীতে চুন পরিস্কার করে ১৪৭২ সালে লিখিত একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। এটি জালাল উদ্দিন আবুল মোজাফ্ফর ফতে শাহ'র রক্ষক মোবারকউদ্দৌলা কর্তৃক নির্মিত ও খোদিত হয়। যিনি মুয়াজ্জামাবাদের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন।

ইব্রাহিম দানিশমান্দের সমাধি সৌধ

মোগরাপাড়ায় অবস্থিত নওবতখানা থেকে সামান্য উত্তরে একটি খানকাহ ও তদসংলগ্ন প্রাচীরঘেরা স্থানে উত্তর দেয়ালের সঙ্গে পরপর ৪টি পাকা কবর আছে।

এর মধ্যে প্রখ্যাত সুফী সাধক ইব্রাহিম দানিশমান্দের খানকা ও সমাধিটি আকর্ষণীয়। ধারণা কারা হয় যে, তিনি পারস্য থেকে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য শুভাগমন করেন। তিনি সুলতান হোসেন শাহের শাসন আমলে সোনারগাঁয় আসেন। এস এম তাইফুর তাঁর Glimpses of old Dhaka' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'মসজিদ চত্বরে তিনটি বাংলা চৌচালা ছাদের মতো সমাধি রয়েছে। পশ্চিম দিকের সমাধিতে সৈয়দ ইব্রাহিম দানিশমান্দের শবাধার রয়েছে। মধ্যবর্তী সমাধিটি তাঁর বংশধর মোহাম্মদের এবং পরবর্তী দুটি সমাধি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ ইউসুফ এবং তাঁর পত্নী আয়েশা বানুর।'[১৮]

শেখ মুহাম্মদ ইউসুফ এবং শেখ মাহমুদ-এর সমাধি সৌধ

ইব্রাহিম দানিশমান্দের সমাধির উত্তর দিকে রয়েছে বিখ্যাত সুফি সাধক শেখ মুহাম্মদ ইউসুফের দর্শনীয় সমাধি সৌধ ও খানকাহ। এই মহান সাধক বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য সুদূর পারস্য থেকে সোনারগাঁয়ে শুভাগমন করেন বলে ধারণা করা হয়। মোগরাপাড়ায় পিতা শেখ মুহাম্মদ ইউসুফ ও তাঁর পুত্র শেখ মাহমুদ দু'জনেরই একটি আয়তাকার সমাধি সৌধ রয়েছে। বাংলাদেশের চৌচালারীতির কুঁড়ে ঘরের আদলে নির্মিত এ সমাধি ১৬শ' শতাব্দীর।

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার সমাধি

বাংলাদেশের মুসলিম মনীষীদের ইতিহাসে শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা(রহ.) এক অনন্য আলোকোজ্জ্বল নাম এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি বোখারার এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে (১২৬৬-১২২৮) তিনি দিল্লীতে পৌঁছেন। সেখান থেকে পীর আবু তাওয়ামার সংগে ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সোনারগাঁয় আসেন। এখানে তিনি 'জামেয়া' বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও খানকা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

এম এ রহিমের ভাষায়, শায়খ আবু তাওয়ামাই ছিলেন সোনারগাঁ পূর্ব বাংলার মহান গৌরবের প্রকৃত কর্ণধার। তাঁর পাণ্ডিত্য আধ্যাত্মিক সাফল্য বহু সাধক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে সোনারগাঁয় আকৃষ্ট করেছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মখদুম মাওলানা শারফুদ্দীন ইয়াহ ইয়া মানেরী। তিনি তাঁর শিক্ষকের সাথে সোনারগাঁয় এসেছিলেন। বলা যায়– এসব বিখ্যাত সাধক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপস্থিতি সঠিকভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি সোনারগাঁয়ের ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান চর্চাকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল।

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা-এর সমাধি, মোগরাপাড়া

শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাকে বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ বলা হয়। এই মহান মনীষী ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

দাড়োগোল্লা শেখ সাহেব জামে মসজিদ

এ মসজিদটি কাইকারটেক নবাব হাবিব উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের উত্তর পাশে অবস্থিত। দাড়োগোল্লা জামে মসজিদ ১৭৩৬ খ্রি. নির্মিত হয়ে। এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ। মসজিদের পশ্চিম পাশে একটি শানবাঁধানো পুকুর রয়েছে। এলাকার বয়স্ক লোকদের সাথে আলোচনায় জানা যায় আলোচিত মসজিদ কমপ্লেক্সের উত্তর-পূর্বদিকে একটি ভগ্নপ্রায় মুসাফিরখানা আছে।

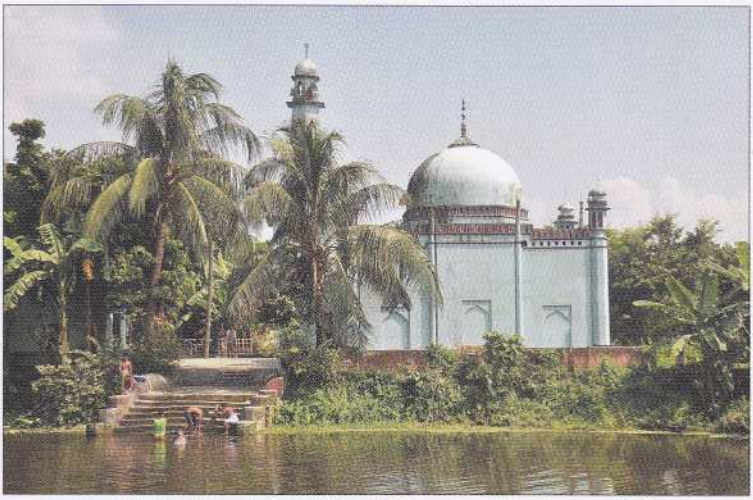

কাইকারটেক দাড়োগোল্লা মসজিদ, সময়কাল : ১৭৩৬ খ্রি.

ভগ্ন মুসাফির খানা, কাইকারটেক

গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের সমাধি সৌধ

এ সমাধি সৌধটি সোনারগাঁয়ের শাহচিল্লাপুরে অবস্থিত। এটি সুলতানি আমলের তৈরি একটি প্রাচীনতম সমাধি সৌধ। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ ইলিয়াস শাহী বংশের সবচেয়ে স্বনামধন্য সুলতান ছিলেন। বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহ নিহত হলে ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। বাংলাদেশের সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মত বর্ণাঢ্য চরিত্রের আর কোনো সুলতান ছিলেন না। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে রাজা গণেশের ষড়যন্ত্রে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিহত হলে শাহচিল্লাপুরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

তাঁর সমাধি সম্পর্কে জেম্‌স ওয়াইজ প্রত্যদর্শী হিসেবে বর্ণনা করেন, The mausoleum has now fallen to pieces but formerly it consisted of a ponderous stone, which occupied the centre, surrounded by pillars about five feet high. these stones are beautifully carved and the corners of the slabs and the arabesque tracery are as per-fect as the day the workman handled. The stones are formed of hard. almost black basalt. তাঁর সমাধি বাংলার ১৫শ' শতাব্দীর একটি উৎকৃষ্ট ইসলামী স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন। তাঁর সমাধির পার্শ্বে রয়েছে সারিবদ্ধ প্যানেল। এটি দেখতে খিলানযুক্ত জানালার ছাদ হতে ঝুলন্ত শিকার মতো দেখায়। সমাধির অলঙ্কারিক দিক সম্বন্ধে এ- এইচ দানী বলেন, 'প্রস্তর ফলকের কার্ণিশে রয়েছে বিলেট অলঙ্করণের একটি সারি। এর নিচেই রয়েছে মুক্তদানার অলঙ্করণ। এ পদ্ধতির সাথে আদিনা মসজিদের ব্যবহৃত অলঙ্করণ পদ্ধতির খুবই সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এর নিচে তিনটি প্যানেল শোভা পাচ্ছে। প্রতিটি প্যানেলে ঝুলন্ত বাতিসহ খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গি দেখা যায়। এর বাতিগুলো আদিনা মসজিদের মিহরাবের ঝুলন্ত বাতির মতো। তবে এ সমাধির বাতিগুলো আদিনা মসজিদের বাতির এক শিকলের পরিবর্তে দু'শিকলের সাহায্যে ঝুলে আছে।' তাঁর সমাধির কালো পাথরের সূক্ষ্মকারুকাজ শোভিত নক্‌শাগুলো এদেশে বিদ্যমান মুসলিম পুরাকীর্তির মধ্যে খুবই আকর্ষণীয়।

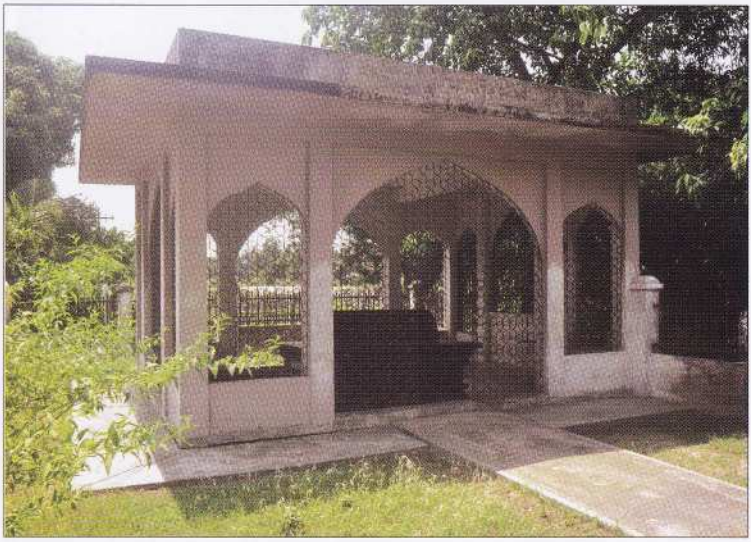

সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ'র সমাধি সৌধ

সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ'র সমাধি, সময়কাল : ১৫শ শতাব্দী

সুলতান গিয়াসদ্দিন আজম শাহের ন্যায়বিচার, বদান্যতা, বিদ্যোৎসাহিতা, ধর্মানুরাগ ও কাব্যচর্চার বহু ঘটনা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। রিয়াযু'স-সালাতীনের মতে, তীরন্দাজির অনুশীলনের সময় সুলতানের নিক্ষিপ্ত একটি তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জনৈক বিধবার একমাত্র শিশুকে নিহত করে। বিধবা তৎকালীন কাজীউল কুযাত-প্রধান বিচারপতি কাজী সিরাজুদ্দীনের কাছে বিচারপ্রার্থী হলে তিনি নির্ভয়ে সুলতানের নামে সমনজারি করেন। সুলতান কাজীর আদালতে হাজির হলে কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন না করে কাজী তাঁর বিরুদ্ধে বিধবার অভিযোগের কথা উল্লেখ করেন এবং বিধবাকে ক্ষতিপূরণ দানে সন্তুষ্ট করতে না পারলে শরীয়াত মতে তিনি দণ্ডনীয় হবেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সুলতান বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে বিধবার অভিযোগের সন্তোষজনক মীমাংসার কথা কাজীকে অবহিত করেন। কাজী সাহেব তখন স্বীয় আসন থেকে উঠে এসে সুলতানকে সালাম দিতেই তিনি বলেন- 'আমার রাজ্যে এমন একজন ন্যায়বিচারক কাজী আছেন এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।' এরপর তিনি জামার মধ্যে লুকায়িত ছুরি বের করে কাজীকে বললেন, 'সুলতানের ভয়ে আপনি ন্যায়-বিচার না করলে এই ছুরি আপনার বুক বিদ্ধ করত।' কাজী সাহেবও তখন তাঁর আসনের নীচ হতে একটি কোড়া এনে সুলতানকে বললেন, 'হুজুর, আপনিও যদি শরী'য়াতের বিচার না মানতেন তবে এই কোড়া আপনার পিঠে পড়ত।'

আরেকটি ঘটনা যা সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে তা হলো, পারস্যের খ্যাতনামা কবি হাফিজ শিরাজীর সাথে পত্রালাপ এবং তাঁকে বাংলাদেশ সফরের আহ্বান জানানো। রিয়াযূজ-সালাতীনের লেখক গোলাম হুসায়ন সালীমের বর্ণনা মতে সুলতান গিয়াস উদ্দিন আরবি ফার্সি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি কবিতাও রচনা করতেন। একটি ফার্সি কবিতার শেষ চরণের ছন্দ মেলাতে অসমর্থ হয়ে তিনি একজন দূতকে অসম্পূর্ণ কবিতাটি বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ কবি হাফিজ-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁকে বাংলাদেশ সফরের নিমন্ত্রণ জানান। কবি হাফিজ যথাসময়ে সুলতানের রচিত কবিতার প্রথম চরণের ছন্দের সাথে মিল রেখে একটি দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেন এবং দূতের মারফত ফেরত পাঠান এবং যাতায়াতের অসুবিধার কারণে সুলতানের নিমন্ত্রণ গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

'দীওয়ান-ই-হাফিজে' সংকলিত এই কবিতাটি বাংলাদেশ ও সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের নাম মুসলিম বিশ্বে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন মক্কা শরীফে একটি মাদ্রাসা ও একটি মুসাফিরখানা নির্মাণ এবং মক্কাবাসীদের পানি সরবরাহের সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে একটি নহর খননের জন্য বহু সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেন। তাঁর অর্থে নির্মিত মাদ্রাসাটি গিয়াসিয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত ছিল। মাদ্রাসা ও মুসাফিরখানা পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্যে দু'টি খেজুরবাগান বহু অর্থে ক্রয় করে ওয়াকফ করে দেয়া হয়। ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে গিয়াসিয়া মাদ্রাসার বিরাট অবদান সর্বজনস্বীকৃত। (তারিখে মক্কা, মুফতী কুত্‌বুদ্দীন)।

কাজী সিরাজ উদ্দিন-এর সমাধি

দ্র : The History of Bengal, Ed. by J.N. Sarkar, vol. II, P 11; Memoirs of Gour and Pandua, M. Abid Ali, New Delhi, 1979, pp 24-27; 'গৌরের ইতিহাস, রজনীকান্ত চক্রবর্তী; ২য় খণ্ড, ৬১-৬৬, ১ম সংস্করণ, ১৯০৯। বাংলার বীর, কালীপ্রসন্ন দাস, ১ম খণ্ড, ১০৩-১১০; কলিকাতা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ,

পাঁচ পীর সমাধি

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি থেকে সামান্য পশ্চিমদিকে ভাগলপুর গ্রামে এ সমাধি অবস্থিত। সোনারগাঁয়ের গৌরবময় স্থাপত্য শিল্পের একটি অপূর্ব নিদর্শন পাঁচ পীরের সমাধি। জেমস ওয়াইজের বর্ণনা থেকে জানা যায়, পাঁচ পীরের সমাধি একই সমান্তরালে স্থাপিত এবং ভূমি থেকে প্রায় ৪ ফুট উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাচীনকালে ব্রহ্মপুত্র নদী এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এক সময়ে সমাধিগুলোকে ছাদ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করা হলেও এদের স্তম্ভসমূহকে কখনোই সামান্য কয়েক ফুটের বেশি উঁচু করা হয়নি। এসব সমাধির সময়কাল, সাধু পুরুষদের জীবনী এবং তাঁরা কোন দেশ থেকে এসেছিলেন সে সবের কোনো তথ্য জানা যায়নি। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, পাঁচজন মহান ধর্ম প্রচারক আরও দেশ থেকে এসেছিলেন। এক সময়ে পাঁচ পীরের প্রত্যেকের মাথা বরাবর বাংলার কুঁড়েঘর আকৃতির ইটের নির্মিত চেরাগদানী ছিল। তাঁদের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

পাঁচ পীরের সমাধি, ভাগলপুর, সোনারগাঁও

তথাপী পাঁচ পীরের ভক্তি মতবাদ বাংলায় বহুল ভাবে পরিচিত। ড. আব্দুর রহিম লিখেছেন, A dorgah of Panch Pir exists in sonargaon. The sailors and boatmen of East bengal even now invoke the blessings of Panch Pir along the name of Pir Badr, who is identilfied with Badr-al Din Badr-i-Alam. এই পাঁচজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সমাধি ১৭শ শতাব্দীতে নির্মিত। সাধু পুরুষের দেহাবশেষ ধারণকারী উঁচু প্লাট ফরমের ধার জুড়ে অসম্পূর্ণ ইটের স্তম্ভ রয়েছে। দেখে মনে হয় যে এটি মূলত ছাদ তৈরির জন্য অথবা জাফরি কাটা রেলিং বসানোর জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অনুরূপ বদরে আলম বা পীর বদরের একটি পবিত্র স্থান প্রত্যক্ষ করা যায়। পাঁচ পীরের সমাধি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের জন্য বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শনের স্থান। এখনো অনেক লোক এ সমাধিতে দোয়া নিতে আসেন।

কদম রসুল

'কদম রসুল সৌধটি নারায়ণগঞ্জের বিপরীতে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব দিকে নবীগঞ্জে অবস্থিত। কদম রসুল দরগাহ নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ইতিহাসবিদদের মতে মাসুম খান কাবুলী নামে একজন আফগান রাজা সেনা প্রধান সপ্তম শতাব্দীতে এই নিদর্শনটি একজন আরব সওদাগর এর নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। বর্তমানে যে মঠের ভেতর কদম রসুলে ফলকটি রক্ষিত সেটি ১৭৭৭-৭৮ খ্রি. গোলাম নবী নামে ঢাকার একজন জমিদার এর হাতে নির্মিতা। দরগার ভেতর মঠটি ছাড়াও একটি মসজিদ রয়েছে। বিশেষ করে দরগার প্রবেশদ্বারের বর্তমান নির্মাণশৈলী সবার নজর কেড়ে নেয়।

বাংলাদেশের নারয়ণগঞ্জ জেলা ছাড়াও চট্টগ্রামে এরকম আরো দুইটি দরগাহ রয়েছে। তবে নবীগঞ্জে অবস্থিত কদমরসুল দরগাটিই সর্বাধিক পরিচিত। ষোল শতকের শেষদিকে মাসুম খাঁ কাবুলি নামে একজন সম্ভ্রান্ত রাজা ছিলেন। ইনি ঈসা খাঁর বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে আরব বণিকদের নিকট থেকে বহু অর্থের বিনিময়ে এই মহা মূল্যবান পাথরটি কিনে নেন। এবং এ স্থানে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। সুবেদার ইসলাম খান, শাহজাহান সহ আরো অনেক আমির-ওমরা এ স্থান দর্শন করেন।

কদম রসূল দরগা, বর্তমান চিত্র

সোনাকান্দা দুর্গ

এটি শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় অবস্থিত একটি মুঘল জলদুর্গ। হাজীগঞ্জ দুর্গের বিপরীত দিকে এ দুর্গের অবস্থান। নদীপথে ঢাকায় সাথে সংযোগ রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ নদীপথগুলোর নিরাপত্তা বিধানের জন্য মুঘল শাসকগণ যতগুলো জলদুর্গ নির্মাণ করেছিলেন তার মধ্যে সোনাকান্দা দুর্গ অন্যতম।

দুর্গটিতে দুটি প্রধান অংশ আছে। একটি অংশ বিশাল আয়তনের মাটির ঢিবিসহকারে গঠিত দুর্গপ্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। আয়তাকারে নির্মিত এদুর্গ পূর্ব-পশ্চিমে ৩০০ শত ফুট লম্বা। উত্তর দক্ষিণে ২০৮ ফুট চওড়া। ইটের তৈরি দুর্গের দেয়াল ৩.৫ ফুট পুরু ও ১০ ফুট উঁচু। যার মধ্যে গোলা নিক্ষেপের জন্য বহু সংখ্যক প্রশস্ত-অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে।

অপর অংশটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, যা দুর্গের অভ্যন্তরে পশ্চিমাংশে নির্মিত। দুর্গ প্রাচীরের সর্বত্র গুলি ছোড়ার ব্যবস্থাসহ মেরলেন দ্বারা সজ্জিত। এ দুর্গটিতে প্রবেশের জন্য উত্তরদিকে একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। দেশের অন্যান্য মুঘল জলদুর্গগুলোর নির্মাণরীতির সাথে সাদৃশ্য থাকায় এটিকে সপ্তদশ শতকের নির্মিত দুর্গ বলে ধারণা করা হয়।

মুঘল আমলে নির্মিত সোনাকান্দা দুর্গ, বন্দর উপজেলা

মুঘল আমলে নির্মিত সোনাকান্দা দুর্গের গেইট

বিবি মরিয়মের সমাধি সৌধ

শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে নারায়ণগঞ্জের হাজীগঞ্জে বিবি মরিয়মের সমাধি সৌধ অবস্থিত। এটি মুঘল সমাধি রীতির এক অনুপম নিদর্শন।

বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানের কন্যা ছিলেন বিবি মরিয়ম। প্রাণপ্রিয় কন্যার স্মৃতিকে অমর করে রাখতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শায়েস্তা খান এটি নির্মাণ করেন বলে জানা যায়।

সমাধি সৌধের মধ্যবর্তী কক্ষে রয়েছে ইট নির্মিত বিবি মরিয়মের বৃহদায়তন সমাধি। এর কেন্দ্রীয় সমাধি ইমারতটি বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট।

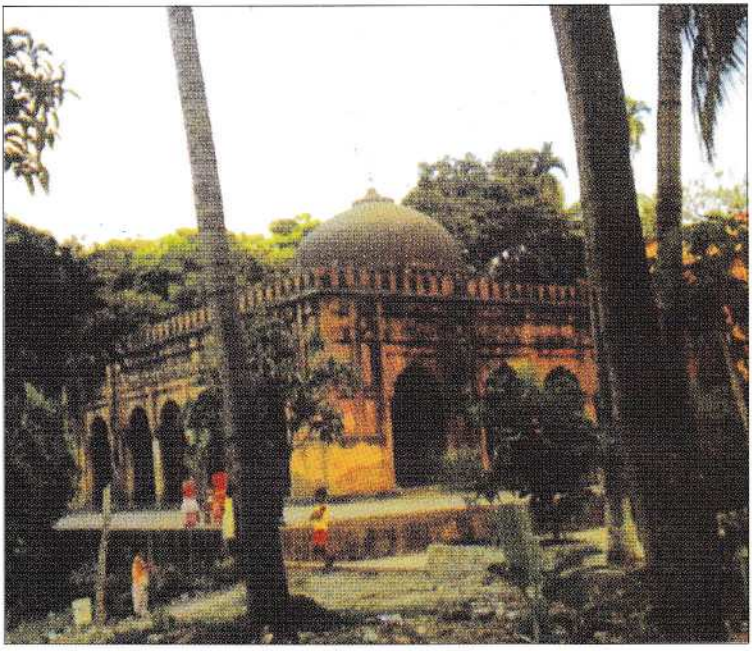

বিবি মরিয়ম সমাধি সৌধ

সৌধের কেন্দ্রীয় কক্ষটির প্রত্যেক দিকে তিনটি খিলান আছে। এ খিলানগুলো সম-আকৃতির ও লৌহজালিকা সমৃদ্ধ। এর বারান্দার বহির্দেয়ালের চারদিকে পাঁচটি খিলানে বিভক্ত। এ খিলানগুলো আকারে বড়। অনুপম স্থাপত্য নৈপুণ্যে ভরা এ সমাধি সৌধটি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়।

হাজীগঞ্জ দুর্গ

এই দুর্গটি নারায়ণগঞ্জ শহরের হাজীগঞ্জ এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এর নির্মাণ কৌশল ও অবস্থান দেখে অনুমতি হয়, নৌপথে অভিযানকারী জলদস্যুদের 'মগ ও পুর্তুগিজ' জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সম্ভবত 'মীর জুমলার' সময়ে হাজীগঞ্জ দুর্গ নির্মিত হয়। চতুর্ভূজাকৃতির এই দুর্গের পঞ্চভূজ বেষ্টনী প্রাচীরে রয়েছে বন্দুক বসিয়ে গুলি চালাবার ছিদ্র। এই দুর্গটি চারকোণে গোলাকার বুরুজ দ্বারা সুরক্ষিত। প্রাচীরের চারদিকের অভ্যন্তর ভাগে রয়েছে চলাফেরার পথ, এককোণে ইটের তৈরি সুউচ্চ চৌকাস্তম্ভ এবং নদীর দিকে একটি ফটক রয়েছে।

মুঘল আমলে নির্মিত হাজীগঞ্জ দুর্গ, নারয়ণগঞ্জ

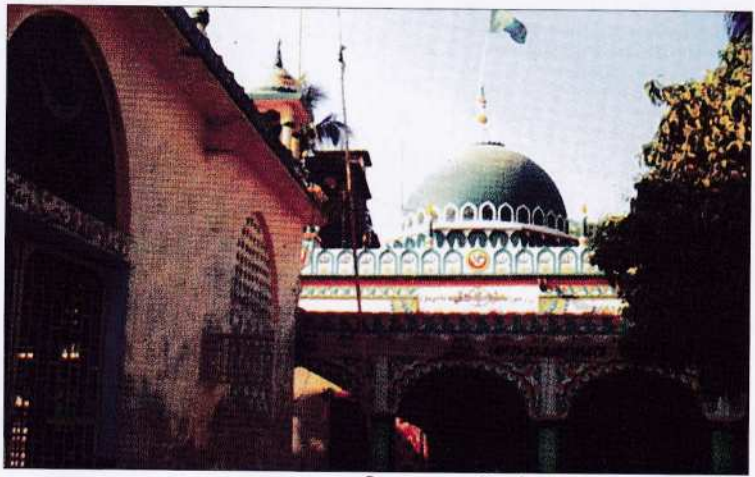

বাবা সালেহ মসজিদ ও সমাধি সৌধ

বাবা সালেহের সমাধি ও মসজিদ

বাবা সালেহের সমাধি ও মসজিদ নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলাকায় অবস্থিত। সুলতানি ও মুঘল আমলে এ স্থানটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সুলতান জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহের আমলে (১৪৮৪) এটি নির্মিত হয়। আলোচিত মসজিদটি সুলতানি আমলের একটি স্থাপত্য কীর্তি।

মসজিদের মিহরাব ও মেঝে কালো পাথরের এবং গম্বুজ পাথরের পিলারের দ্বারা তৈরি। এর পূর্বদিকে রয়েছে বাবা সালেহের সমাধি। এ এলাকাটি বর্তমান সালেহ নগর নামে পরিচিত। সোনারগাঁয়ে ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য দরবেশ ছিলেন। বাবা সালেহ ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

লাঙ্গলবন্দ

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত লাঙ্গলবন্দ একটি প্রাচীন জনপদ । এটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি তীর্থস্থান। প্রতিবছর চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে এখানে পূণ্য স্নানার্থে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্তপ্রাণের আগমন ঘটে। এ সময় ব্রহ্মপুত্র নদে অবগাহন খুবই পুণ্যের। এখানে ব্রহ্মার সন্তুষ্টি লাভ করে পাপমোচন হয়। এই স্নানই অষ্টমীস্নান নামে অভিহিত। এ সম্পর্কে একটি পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে, 'কোন এক দূর অতীতে জমগ্নি মহামতির রেনুকা নামে এক রাজবংশীয় পরমাসুন্দরী স্ত্রী ছিল। তার পাঁচ পুত্র ছিল। সর্বকনিষ্ঠের নাম ছিল পরশুরাম। ঘটনাক্রমে মার্তিকাবর্ত দেশের রাজাকে সস্ত্রীক জলবিহার করতে দেখে আশ্রমবাসিনী রেণুকা কামস্পৃহ হয়ে পড়েন এবং নিজের পূর্ব-রাজকীয় জীবন সম্পর্কে স্মৃতিবিষ্ট হন। মুনি স্ত্রীর এই আসক্তি দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে পাঁচ পুত্রকে তাদের মাতাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কোনো পুত্রই মাতৃহত্যার মতো নিষ্ঠুর কাজ করতে রাজি হলো না। তখন মুনি তার প্রিয় পুত্র পরশুরামকে আদেশ দিলেন। পরশুরাম এক কুঠারের আঘাতে মাকে হত্যা করেন। মাকে হত্যা করে পরশুরাম পরম পাপী হিসেবে চিহ্নিত হন। পাপের শাস্তি হিসেবে কুঠারটি তার হাতে আটকে থাকে। শত চেষ্টা করেও তা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারলেন না।

তখন পিতা তাকে বিভিন্ন তীর্থস্থানে গিয়ে পাপমুক্ত হতে বলেন। মাতৃহত্যার ভয়াবহ পাপের অনুশোচনা নিয়ে তিনি তীর্থ থেকে তীর্থে ঘুরে বেড়ান।

দেবতা ব্রহ্মপুত্র তখন হিমালয়ের বুকে হ্রদরূপে লুকিয়ে ছিলেন। দৈবক্রমে পরশুরাম ব্রহ্মপুত্রের মাহাত্ম্যের কথা জানতে পারেন। তিনি হিমালয়ে লুকায়িত ব্রহ্মপুত্র হ্রদ খুঁজে পেয়ে প্রার্থনা জানালেন যেন এর পবিত্র জলে তার পাপমোচন হয়। তিনি হ্রদের জলে ঝাঁপ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে আটকে থাকা কুঠারখানা খসে পড়ে। এভাবে তিনি মাতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত থেকে মুক্ত হলেন। ব্রহ্মপুত্রের এই ঐশিক শক্তিসম্পন্ন পাপহরণকারী জল যাতে সাধারণ মানুষের উপকারে আসে এ জন্য পরশুরাম সেই জলধারাকে সমতল ভূমিতে নিয়ে আসার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি কুঠারখানা লাঙলের ফলকে বেঁধে সেই ফলক দিয়ে নালা সৃষ্টি করে ব্রহ্মপুত্রের পবিত্র জলধারাকে সমতল ভূমিতে নিয়ে অসেন।

দীর্ঘ সময় ও পথ পরিক্রমায় পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে তিনি ব্রহ্মপুত্রের জলধারাকে বিভিন্ন জনপদ ঘুরিয়ে অবশেষে লাঙলবন্দে এসে পরিশ্রান্ত হয়ে থেমে যান এবং লাঙল চষা বন্ধ করে দেন। তার লাঙ্গলের ফলকে তৈরি পথ ধরে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হতে থাকে। সেই থেকে এ জায়গার নাম হয় লাঙ্গলবন্দ। এটি পরবর্তীতে হিন্দুধর্মের মানুষের জন্য পরম পুণ্যস্থানে পরিণত হয়।

লাঙ্গলবন্দের ব্রহ্মপুত্র নদে পুণ্যস্নান

এরপর পরশুরাম এ পবিত্র ব্রহ্মপুত্র নদের ঐশিক শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণে যান। কিন্তু যেখানে এসে ব্রহ্মপুত্র থেমে গেলেন তার কাছাকাছি দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল বাংলাদেশের এক সুন্দরী নদী শীতলক্ষ্যা। ব্রহ্মপুত্রের কাছে সুন্দরী শীতলক্ষ্যার রূপ-যৌবনের কথা পৌঁছুলে ব্রহ্মপুত্র প্রচণ্ড বেগে সুন্দরী শীতলক্ষ্যার দিকে ধাবিত হলেন। ব্রহ্মপুত্রের এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে সুন্দরী শীতলক্ষ্যা তার সৌন্দর্য আড়াল করে বৃদ্ধার রূপ ধারণ করে নিজেকে বুড়িগঙ্গারূপে উপস্থাপন করেন। ব্রহ্মপুত্র বুড়িগঙ্গারূপী শীতলক্ষ্যার এই কুৎসিত চেহারা প্রত্যক্ষ করে মর্মাহত হন। এরপর ক্রোধান্বিত হয়ে তার ঘোমটা খোলার পর লক্ষ্যার সৌন্দর্য অবলোকনে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে মিলিত হন। এরপর দু'জনের মিলিত স্রোতধারা একই সঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে।

এদিকে পরশুরাম তীর্থভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তন করে দেখেন, যে ব্রহ্মপুত্রকে তিনি মানুষের উপকারার্থে সমতল ভূমিতে নিয়ে এসেছিলেন, যাকে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম নদরূপে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তিনি শীতলক্ষ্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তখন পরশুরাম তাদের দু'জনকে অভিশাপ দিলেন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র পরশুরামের যে উপকার করেছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইলেন। পরশুরামের মনে দয়ার উদয় হলে তিনি ব্রহ্মপুত্রের পাপ মোচনের অসামান্য শক্তি হরণ করে একদিনই তার ঐশিকশক্তি অক্ষুন্ন রাখেন। অষ্টমী তিথিতেই থাকে সেই শক্তি। এজন্য প্রতিবছর লাঙ্গলবন্দে পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়।

স্নানের সুবিধার্থে লাঙ্গলবন্দে রাজ ঘাট, প্রেমতলা ঘাট, অন্নপূর্ণা ঘাট, বরদেশ্বরী ঘাট, জয়কালী ঘাট, গান্ধী ঘাট, পাঠানকালী ঘাট, কালিবাড়ি ঘাট, শ্রীরাম ঘাট, শঙ্কর ঘাট, শিখরী ঘাট, রক্ষাকালী ঘাট, ও কালীদহ ঘাট নির্মিত হয়েছে।'[২০] ভারত, নেপালসহ দূর-দুরান্ত থেকে আগত শুভানুধ্যায়ী পুণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটে লাঙ্গলবন্দে। এ উপলক্ষে প্রতিবছর বর্ণিল মেলা বসে।

দেওয়ানবাগ শাহী জামে মসজিদ

এটি নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার মদনপুরস্থ দেওয়ানবাগ নামক জায়গায় অবস্থিত। মসজিদ দেয়ালে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় আনুমানিক ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে আলোচিত মসজিদটি নির্মিত । ১৯৫১ সালে সংস্কার এবং ১৯৯১ সালে সম্প্রসারণ কাজের ফলে মসজিদের আদিরূপ হারিয়ে গেছে। এটি ময়মুননেছা বিবি ওয়াক্‌ফ এস্ট্রেট দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা যায়।

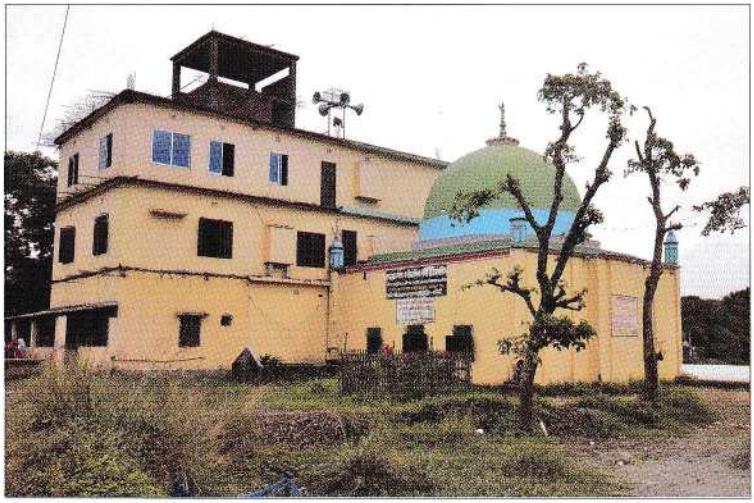

মদনপুর, দেওয়ানবাগ মসজিদের বর্তমান চিত্র

মহজমপুর শাহী জামে মসজিদ

ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের একটি প্রাচীনতম মুসলিম এলাকা মুয়াজ্জামাবাদ। এটি সোনারগাঁয়ের জামপুর ইউনিয়নের মুয়াজ্জামপুর বা মহজমপুর গ্রামে অবস্থিত। এস.এম তাইফুরের মতে, 'সুলতান সিকান্দার শাহের জনৈক সিপাহী মুয়াজ্জামের নাম থেকেই এ নামের উৎপত্তি। এটি একইসাথে টাকশাল নগরী ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ছিল। যার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদে।' আইন-ই-আকবরীতে সরকার সোনারগাঁয়ের অধীনে এই মুয়াজ্জামপুর মহল্লার উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এটি হলো ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষ্যা নদীর মধ্যবর্তী এলাকার প্রধান শহর। জনাব শামস আল-দীন আহমদ শাহ কর্তৃক ৮৩৩-৮৩৯ হিজরি মোতাবেক ১৪৩২ / ১৪৩৩-১৪৩৫/৩৬ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদটি নির্মিত হয়। এজন্য এটি আহমদ শাহের মসজিদ নামে

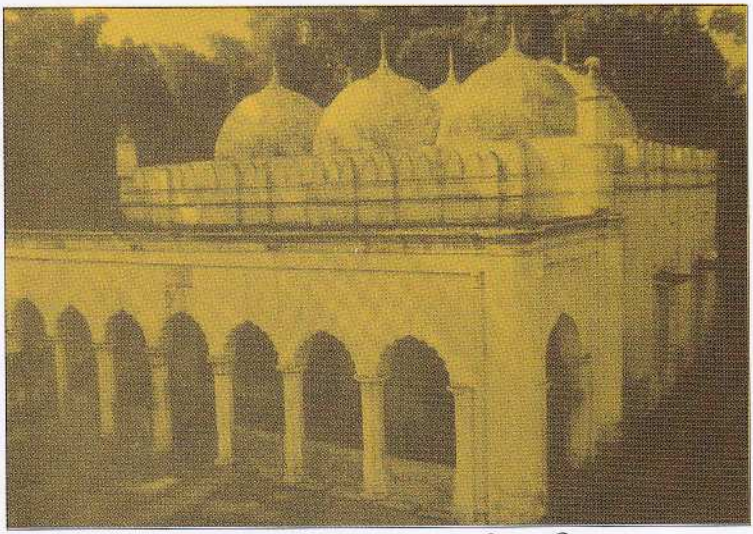

মহজমপুর মসজিদের আদিরূপ, ছবি সংগৃহীত

সুলতানি আমলে নির্মিত মহজমপুর মসজিদ

পরিচিত। বর্তমানে আলোচিত মসজিদের তিনদিকেই সম্প্রসারণ কাজ করা হচ্ছে। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালের কেন্দ্রীয় মিহরাব এর দু'পাশে দু'টি ছোট মিহরাবের চার দিকে এবং ৮টি কালো পাথরের পিলারের ওপর ৬টি গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে। এটি সোনারগাঁয়ের সবচেয়ে প্রাচীনতম মসজিদ। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের বাইরে

ঐতিহাসিক গোয়ালদি মসজিদে ব্যবহৃত টেরাকোটার ফুলেল নকশা প্রত্যক্ষ করা যায়। এর স্থাপত্য নকশা অলঙ্করণ পদ্ধতি এবং মসজিদের ছাদে দুই সারিতে ছয়টি গম্বুজের নির্মাণশৈলী পর্যটকদের আকৃষ্ট করে।

সুলতানি আমলে নির্মিত মহজমপুর মসজিদের গম্বুজ

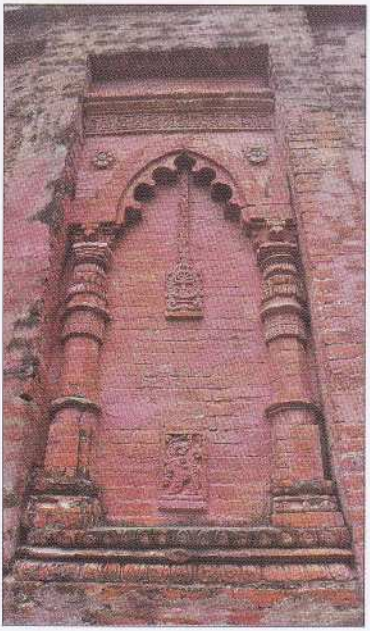

মসজিদ দেয়ালের ফুলেল নক্‌শা

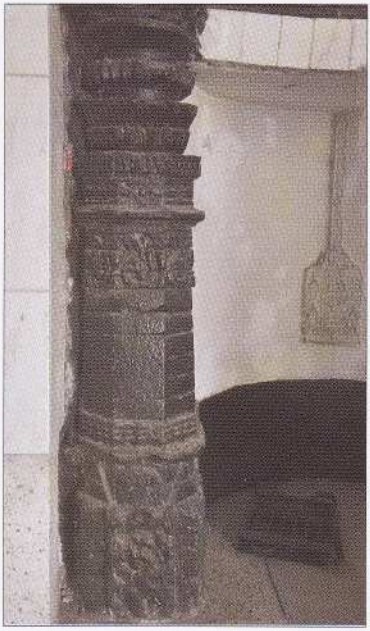

মিহরাবে অলংকৃত পাথরের পিলার

হযরত শাহ আলম (র.) শাহ লঙ্গর সমাধি সৌধ

সোনারগাঁ উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের মহজমপুর শাহী জামে মসজিদ অঙ্গনে লঙ্গর শাহ বা হযরত শাহ আলম (র.) এর সমাধি সৌধ অবস্থিত।

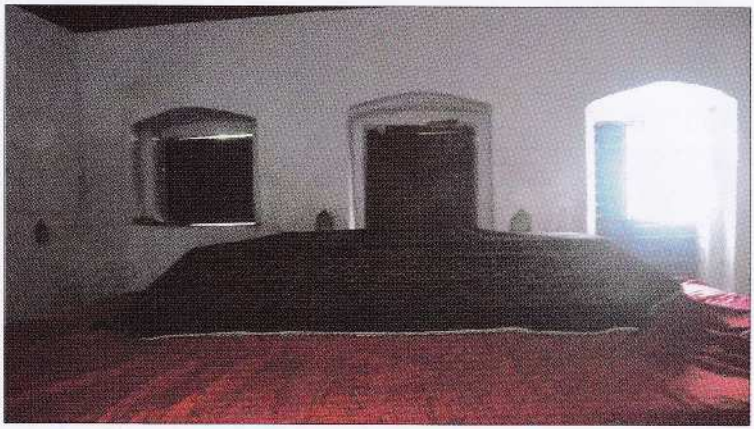

লঙ্গর শাহের শবাধার, মহজমপুর

মহজমপুর লঙ্গর শাহের সমাধি সৌধ

মোজ্জামাবাদ, মুয়াজ্জমপুর বর্তমানে মহজমপুর নামে পরিচিত। ধারণা করা হয় শাহ লঙ্গর শামস্-আল দীন আহমদ শাহ'র রাজত্বকালে ১৪৩২-১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দে বা তার পূর্বে ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ মনে করেন শাহ লঙ্গর বাগদাদের শাহজাদা ছিলেন। সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি মুয়াজ্জাবাদে বা মহজুমপুরে এ আস্তানা গড়েছিলেন।

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারির আশ্রম

সোনারগাঁ উপজেলার বারদী গ্রামে এ আশ্রমটি অবস্থিত। শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারি ছিলেন হিন্দু যোগী-সন্ন্যাসী। আধ্যাত্মিক এই সাধক ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার বারাসাতের অন্তর্গত কচুয়া মতান্তরে চাকলা গ্রামে ১৭৩০/১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাম কানাই ঘোষাল। মাতার নাম কমলা দেবী।

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারির আশ্রম, বারদী

১২ বছর বয়সে কালীঘাটের সাধক ভগবান গাঙ্গুলীর নিকট দীক্ষা নিয়ে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ২৫ বছর ব্রত পালন শেষে হিমালয়ে গিয়ে যোগ সাধনা দ্বারা সিদ্ধি ও যোগবিভূতি প্রাপ্ত হন। এরপর তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে বের হন। লোকনাথের সাধনা ও বিশ্ব ভ্রমণের কারণে গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলী তাঁকে ব্রহ্মচারি উপাধিতে ভূষিত করেন। এ উপাধী পাওয়ার পর তিনি পায়ে হেঁটে পবিত্র মক্কা নগরীতে গিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। অবশেষে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বারদী গ্রামে এসে এ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। জনাব শামসুদ্দোহা চৌধুরী বলেন, 'কিশোর বয়সে তিনি গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর হাত ধরে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা নেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তার ব্রহ্মচার্যের ব্রতে গুরু হোন ত্রৈলঙ্গনাথ স্বামী। উপমহাদেশ খ্যাত তার আশ্রমটি নির্মাণ করে দেন তৎকালীন

বারদীর নাগ জমিদারগণ'। তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন ও শিক্ষার প্রতিপাদ্য হচ্ছে; সর্বভূতে ব্রহ্ম বিরাজমান, আত্মা অমর অবিনাশী, আত্মোপলব্ধি ভক্তি ও একনিষ্ঠ যোগই মুক্তির পথ, কর্ম ও জীবের হিত সাধন-ই শ্রেষ্ঠ মানব ধর্ম। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তনি এই আশ্রমেই ইহধাম ত্যাগ করেন। এটি তাঁর ভক্তজনের তীর্থক্ষেত্ররূপে মানুষের ভালোবাসার স্পর্শে সমাদৃত।

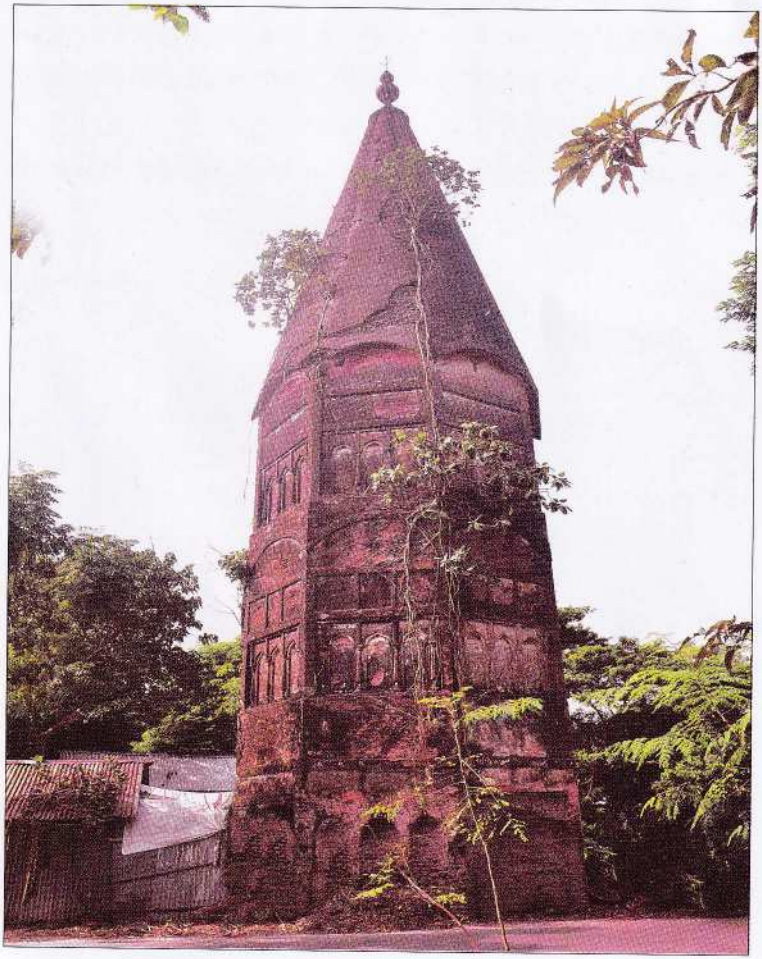

বারদী মঠ, সোনারগাঁও

জ্যোতি বসুর বাড়ি

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমুন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসুর পৈতৃক বাড়িটি সোনারগাঁয়ের বারদীতে অবস্থিত। তিনি ভারতের ইতিহাসে অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আলাদা একটি স্থান দখল করে আছেন। জ্যোতি বসুর পিতা ডা. নিশিকান্ত বসু শত বছর আগে এ বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন। বাড়িটির নির্মাণ কর্তা পাঁচু ওস্তাগার বলে জানা যায়। জ্যোতি বসুর মা হেমলতা বসু ছিলেন মা বাবার একমাত্র সন্তান। বিয়ের সময় ডা. নিশিকান্ত বসুকে এ বাড়ির জমি প্রদান করেন তার শ্বশুর। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে তিনি বাড়িটি নির্মাণ করেন। বাড়িটি জ্যোতি বসুর স্মারক চিহ্ন হিসেবে মাথা উঁচিয়ে এখনো অম্লান।

সোনারগাঁয়ের জৌলুস ও প্রাচীন পুরাকীর্তির নিদর্শন পর্যটকদের স্মৃতিচারণ ও কিংবদন্তিতে আদৃত।

জ্যোতি বসুর বাড়ি, বারদী, সোনারগাঁও

সোনারগাঁয়ের দরবারে

কবি হাফিজের গজল

হে সাকী, দেবদারু, গোলাপ ও লালাফুল পরস্পর কানাকানি করছে,
নেশার গ্লানি, বিদূরণকারী ত্রিপাত্রই তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ।
সুরা আনয়ন কর, কাননের নববধূ আজ অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী,
মধ্যবর্তিনীর কলাকৌশলই এদিনে কার্যকর বলে প্রমাণিত হবে ।
হিন্দুস্থানের সকল তোতাপাখিই এখন সুকণ্ঠ হবে,
কেননা পারস্যের সর্করামিশ্রিত গজল গান যাচ্ছে বাংলাদেশে ।
স্থান ও কালের ব্যবধান উত্তীর্ণকারী কবিতার গতি লক্ষ্য কর-
এক রাত্রের শিশু অতিক্রম করছে এক বছরের পথ ।
সম্রাটের ফুলবনে বসন্ত-বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে
এবং শিশিরের সুরা বর্ষিত হচ্ছে লালফুলের রঙিন পাত্রে ।
ধর্মবেত্তার সেই প্রতারক ও ঐন্দ্রজালিক চক্ষু দু'টির দিকে কর দৃষ্টিপাত;
দেখ, ইন্দ্রজাল বিস্তারকারী দল চলছে তার পেছনে পেছনে ।
আমার মাতাল বন্ধু পায়চারী করছেন ফুলবনে,
তাই মল্লিকার মুখে শিশিরিত হচ্ছে লজ্জার ঘর্মবিন্দু ।
এই দুনিয়ার প্রতারণা থেকে সাবধান হও কেননা এই বৃদ্ধা-
যখন বসে থাকে তখন উচ্চারণ করে যাদুমন্ত্র আর যখন চলে
তখন রচনা করে রকমারী ছলনা
সামেরীর রীতি অনুসরণ করো না, কারণ সে নিজের নির্বুদ্ধিতায়
নষ্ট করেছে তার স্বর্ণ
আর শেষ পর্যন্ত মুসা (আ.) কে ছেড়ে পশ্চাদ্ধাবন করেছে এক গোবৎসের ।
হে হাফিজ, তুমি সুলতান গিয়াসুদ্দীনের দরবারের উৎসাহ থেকে নীরব থেকো না,
কারণ তোমার যশঃ ছড়িয়ে গেছে তোমার ক্রন্দন ও বিলাপ থেকেই ।

(মূল সম্পাদনা-গুল আন্দাম, অনুবাদ : কবি মনিরুদ্দীন ইউসুফ)

চীনের সাথে দূত বিনিময়

বাংলার স্বাধীন সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে দূত বিনিময় হয়। উংলু সম্রাটদের রাজত্বকালে ১৪০৫–১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে য়িং-সে-জে, তি-ঙ বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন চীনে দূত প্রেরণ করেন। চীনের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে দূত প্রেরণের এ তথ্য জানা যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সোনারগাঁও ও চীনের মধ্যে দূত বিনিময় বিস্ময়ের বিষয়। এ সময় প্রায় ২৩০ জন রাজকর্মচারি নিয়ে বাংলার সুলতানের প্রতিনিধি চীনে পৌঁছে। তারা চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের নিকটি পরম সমাদর লাভ করেন। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের চালু করা পররাষ্ট্র নীতি ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

চীনের বিখ্যাত নাবিক ও চীন সম্রাটের প্রতিনিধি চংহ সাতবার সমুদ্র পাড়ি দেন এবং ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় শুভাগমন করেন। সাধারণত শীতকালে চংহর নৌবহর সমুদ্র পাড়ি দিতো। শীতের শান্ত আবহাওয়া তাদেরকে সু-মেন-ত-লা, সুমাত্রা থেকে পাংকোলা, বাংলা রাজ্যে যাওয়ার পথে প্রথম মাওশান এবং সুই-যন, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করতে হতো। এ স্থানে পৌঁছুবার জন্যে জাহাজকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘোরাতে হতো এবং বাতাস অনুকূলে থাকলে ২১ দিন পর চট্টগ্রামে জাহাজ নোঙর করতো। চট্টগ্রামে বড় জাহাজ নোঙর করে অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজে সোন-উর-কঙ সোনারগাঁও বন্দরে এসে চঙহের জাহাজ ভিড়ে।

সুলতানের রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক হাতি ঘোড়সওয়ার সহকারে চীনের প্রতিনিধি দলকে সংবর্ধনা জানিয়ে প্রাসাদে নেয়া হত । তারপর বিশ্রাম নিয়ে তাদের জাহাজ পাংকোলার বাংলার রাজধানী পানতুয়ায় পাণ্ডুয়া পৌঁছে বেশ কিছু দিন পর। মা-হুয়ান, চংহ প্রভৃতি চীনা রাজপ্রতিনিধি এ শহরগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন, বাংলার এ শহরগুলো অপূর্ব সুন্দর। সকল শহরই সুরক্ষিত দেয়াল ঘেরা। প্রশস্ত বিপণী কেন্দ্র। সুদৃশ্য ইমারতে জনাকীর্ণ শহর যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল বলে জানা যায়।

চীনা দূতেরা বাংলাকে একটি বৃহৎ দেশ বলেছেন। রাজদরবারে যারা চাকরি করতেন তাদের অধিকাংই মুসলমান এবং তাদের ব্যবহার ভাল। ভদ্রতা, শিষ্টাচারের বেলায় এ দেশের লোকেরা অনন্য। ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ জাহাজ তৈরি এবং বিদেশিদের সাথে বাণিজ্য করতো। দেশের বেশির ভাগ লোক কৃষক। তাদের গায়ের বর্ণ কালো। অবশ্য মাঝে মাঝে ফরসা চেহারার লোকজনও দেখা যায়। পুরুষেরা মাথা কামায় এবং এক ধরনের ঢিলা জামা পরে। ঐ পোশাক তারা মাথায় জড়িয়ে পড়ে। এরা ছুঁচলো প্রান্ত বিশিষ্ট চামড়ার জুতা পরিধান করে।

বাংলার লোকেরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। যদিও সরকারি ভাবে ফারসি ভাষা প্রচলিত ছিল। মুদ্রা সম্পর্কে চীন দেশের দূতদের চমৎকার ভাষ্য হলো, বাংলার লোকেরা এক ধরনের রূপার মুদ্রা ব্যবহার করতো। এ মুদ্রাকে তারা বলে তংকা। এ মুদ্রা ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত হতো। ছোট ব্যবসার জন্যে তারা সামুদ্রিক কড়ি ব্যবহার করতো।

এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শস্য-ফসলেরও চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন চীনা দূতেরা। তারা এদেশকে গ্রীষ্মকালীন দেশ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বছরে দু'বার ধান পাকার কথা উল্লেখ করেন। এক ধরনের বিশেষ ধান যার দানা খুব লম্বা এবং লাল। এদেশে গম, তিল, রাই, জোয়ার জন্মে। আদা, শর্ষে, পেঁয়াজ, ভাঙ, কোরাস, বেগুন এবং নানা ধরনের তরিতরকারি ও কলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

শহরের রাস্তাগুলোতে নানা ধরনের বিপণী ও ভোজানালয়ের কথা তারা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া রাজপথে প্রতি গালিতে পানাহার, ভোজনাগার ও স্নানাগারের কথাও চীনা রাজপ্রতিনিধিগণ উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগে বাংলায় সুক্ষ্ম মিহি কাপড়ের যে প্রাচুর্য ছিল চীনা দূতগণ এ মসলিন কাপড়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ।

চীনের দূতের বর্ণনায় সুলতানি শাসনামলের অর্থাৎ গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালের একটি সুখী সমৃদ্ধশালী চিত্র ফুটে উঠে। চীন সম্রাটদের সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগ এখন বিস্ময়কর মনে হয়।

বাংলায় বিদেশি পর্যটক

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, এখানকার অধিবাসীদের আন্তরিক আতিথেয়তা বিদেশি পর্যটকদের প্রলুব্ধ করেছে। এদেশে সোনারখনি নেই। আছে অবারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দিগন্ত বিস্তৃত উর্বরভূমি। তাই ভারত উপমহাদেশে যারা এসেছেন, তারা আমাদের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ পরিদর্শনের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেননি। বাঙালি জাতির ইতিহাসে পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলার প্রাচীন রাজধানীর ইতিহাস রচনায় পর্যটকদের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বলে আমার গভীর প্রতীতি।

শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি : চীন-এর বিখ্যাত পর্যটক মাহুয়ান

প্রাচীন বাংলা পরিভ্রমণে আগত বিদেশি পর্যটক এদেশের সমৃদ্ধির কথা স্বীকার করেছেন। S.M Taifoor. Glimpses of old Dhaka গ্রন্থে লিখেছেন- "Bangal has hundred gats open for entrance, but not

one for departure"- অর্থাৎ বাংলায় প্রবেশের শত দরজা রয়েছে। কিন্তু বের হওয়ার একটি দরজাও নেই। বাংলাদেশের মনোলোভা প্রকৃতি, উৎপন্ন ফসল, হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও প্রাচুর্যময় শিল্প-সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হয়ে J.N Dasgupta, Bangal in the sixteenth century A.D গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠায় ইতালির ভারথেমার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- "The best place in the world to live in" -তিনি একই গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন I naver saw a country in which provision were so cheap". সোনারগাঁও বাংলার প্রাচীন রাজধানী থাকায় এখানে শুভাগমণ করেছেন মাহুয়ান, ফেইসিন, রালফ্ ফিচ, ইবনে বতুতা প্রমুখ পর্যটক।

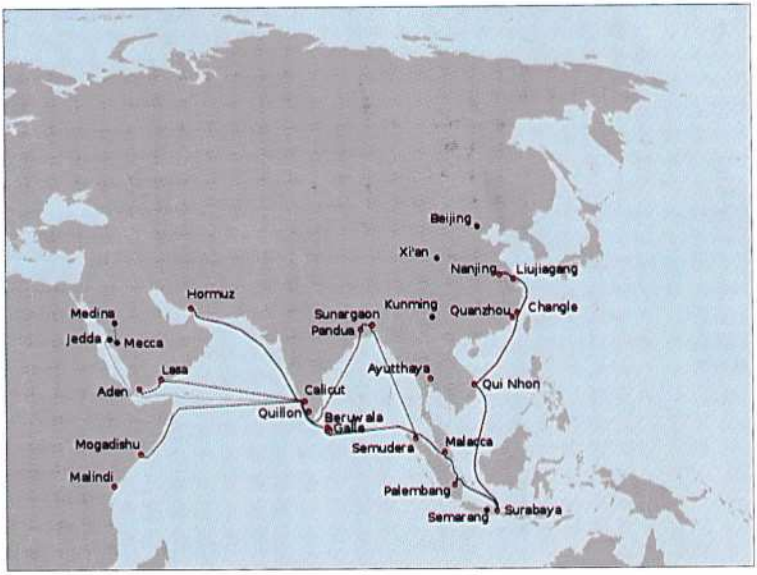

মাহুয়ান-এর পরিভ্রমণ মানচিত্র

মাহুয়ান : মাহুয়ান চীন দেশীয় পর্যটক। 'তিনি সমুদ্র পথে সুমাত্রা দ্বীপ হয়ে নিকোবর থেকে ২০ দিন যাত্রার পর ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম অবতরণ করেন। চট্টগ্রাম থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ যোগে নদীপথে 'সুনউরকং' সোনারগাঁও শহরে উপস্থিত হন। তাঁর মতে সমুদ্রের মুখ থেকে সোনারগাঁয়ের দুরত্ব কমবেশি ৫০ 'লি' ১৫০ মাইল ছিল।'

ফেইসিন : চীন সম্রাট য়ং-লুর শাসনামলে ফেইসিন (১৪০৩-২৫) বাংলায় আসেন। সুলতান সাইফুদ্দিন হামজা শাহের রাজত্বকালে

ফেইসিন বাংলায় এসেছিলেন। তিনিও মাহুয়ানের মত সমুদ্র পথে বাংলায় শুভাগমন করেন। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় রচিত রাজা গণেশের আমল শীর্ষক গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী ফেইসিন তার যাত্রাভিমুখ অনুকূল আবহাওয়ায় সুমাত্রা দ্বীপ থেকে ২০ দিন যাত্রার পর বাংলার সামুদ্রিক বন্দর 'চা-টি-কি আং' চট্টগ্রাম পৌঁছেন। এটিকে অক্টোবর-নভেম্বর মাস ধরা যেতে পারে। তিনি বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তার দরবারে চীন সম্রাটের উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত এদেশে এসেছিলেন।

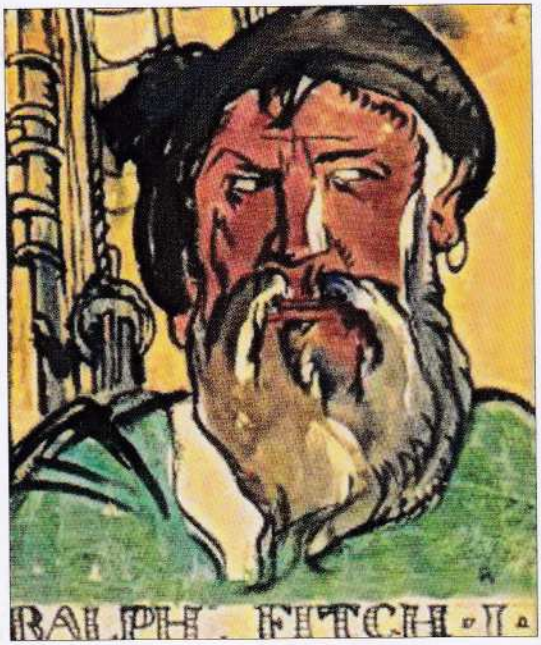

ইংরেজ পর্যটক রালফ্ ফিচ, ছবি সংগৃহীত

রালফ্ ফিচ : ইংরেজ পর্যটক রালফ্ফিচ ১৬ শতকের শেষদিকে বাংলায় পরিভ্রমণ করেন। তিনি ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে টাইগার জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এদেশে আগমণ করেন বলে জানা যায়। রালফ্ ফিচ আগ্রা থেকে যমুনা ও গঙ্গা নদী অতিক্রম করে বেনারস ও পাটনার ভেতর দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেন।

জেমস্ টেলর তাঁর Topography of Dhaka গ্রন্থে লিখেছেন Serripore was situated about 6 leagues to the south of sonargaon. The Portuguese are said to have settled here about the middle of the 16th century" পৃষ্ঠা ৭০। তাঁর মতে শ্রীপুর গঙ্গা

নদীর/পদ্মার তীরে অবস্থিত। এখানকার হিন্দু রাজার নাম চাঁদ রায়। শ্রীপুর থেকে রালফ্ ফিচ ৬ 'লি' দূরে রাজধানী শহর সোনারগাঁয় উপস্থিত হন। মসনদ-ই-আলা ঈশা খানের আমলে চীন সম্রাটের নিকট প্রেরিত রাণী এলিজাবেথের বিশেষ দূত রালফ্ ফিচ পূর্ববাংলা ভ্রমণ করেন। তিনি লিখেছেন, এইসব দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশা খাঁ। তিনি এই অঞ্চলের সকল রাজার রাজা। তিনি খ্রিস্টানদের পরম বন্ধু।...' এটি অত্যন্ত উর্বরদেশ এবং চাউল, তুলা ও রেশমজাত দ্রব্য এখানকার প্রধান পণ্য বলে তিনি বর্ণনা করেন। তারমধ্যে এখানকার অধিবাসিরা খুব ধনাঢ্য এবং সমৃদ্ধশালী।" .... নারীরা তাদের কণ্ঠে রূপোর হাঁসুলী, হাতে বাজুবন্দ, পায়ের আঙুলে রূপো ও তামার অথবা হাতির দাঁতের আংটি পরিধান করে থাকে।'

সোনারগাঁও সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সোনারগাঁও শ্রীপুর থেকে নয় ক্রোশ দূরে। এখানে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট সূতি কাপড় তৈরি হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও গৃহগুলো ক্ষুদ্রাকার এবং সেগুলোতে খড়ের ছাউনি। বাঘ ও শেয়ালের উপদ্রুপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাড়ির চারদিক চাটাইয়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। অধিকাংশ লোকই ধনী। তারা মাংস খায় না অথবা পশু বধ করেনা। পরণে তাদের সামান্যমাত্র বস্ত্র এবং শরীরের অন্যান্য অংশ খোলা। ভাত, দুধ ও ফল-মূল তাদের প্রধান খাদ্য। এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে সূতী-বস্ত্র এবং চাল ভরতের অপরাপর অংশে, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং আরো বহু স্থানে রপ্তানি হয়।'

ইবনে বতুতা : ইবনে বতুতা মরক্কোর তাঞ্জানিয়াতে ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে বতুতা বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম পর্যটক, ইসলামী চিন্তাবিদ, বিচারক এবং ধর্মতাত্ত্বিক। তিনি বিশ্বের খ্যাতিমান পরিব্রাজকদের একজন। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি অজানার পথে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল তিনি মক্কায় পবিত্র হজ্জব্রত পালন করবেন। হজ্জব্রত পালন শেষে দেশে ফিরে না গিয়ে তিনি দেশ ভ্রমণ করতে থাকেন। তাঁর পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ্ মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ আল-লাওয়াতী আল তানজী ইবনে বতুতা। সংক্ষেপে তিনি ইবনে বতুতা নামে পরিচিত। তিনি কখনও স্থায়ী আবাস গড়েননি। সারা জীবন একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেরিয়েছেন। পৃথিবী ভ্রমণের জন্যই তিনি মূলত বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি আফ্রিকা, ইউরোপ থেকে পাকিস্তান, ভারত, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, চীন ও বাংলাদেশ

পরিভ্রমণ করেছিলেন। Mahdi Hussain রচিত The Rehla of Ibn Battuta এর তথ্য থেকে জনা যায়, ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ইবনে বতুতা ভারতে প্রবেশ করেন। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের সময় তিনি- দিল্লিতে পৌঁছেন। সুলতান কর্তৃক কাজী পদে নিযুক্ত হয়ে ৮ বছর সেখানে অবস্থান করেন। দীর্ঘ সময় শাসনকর্তার রাজনৈতিক জীবনের ঘনিষ্ট সন্নিধ্যে থেকে তিনি দিল্লির শাসনকার্যের অভ্যন্তরীণ পরিচয়, রাজন্যবর্গের জীবনচর্চার রীতিনীতির বাস্তব অভিজ্ঞতায় জ্ঞান অর্জন করেন। এ জন্য তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান তথ্য রেখে গেছেন। এর পর সুলতান তাঁকে চীনের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন। পথে জাহাজ ডুবির ফলে তাঁর চীন যাওয়া হয়নি। অবশেষে মালয় দ্বীপপুঞ্জে ১৩৪২, শ্রীলঙ্কা ১৩৪৫ ও দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি বাংলায় আসেন।

ইবনে বতুতার বিশ্বপরিভ্রমণের মানচিত্র

সিলেটে হয়রত শাহ জালাল (রহ) এর দর্শন লাভের উদ্দেশ্যেই তাঁর বাংলায় আগমন। নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে ৪৩ দিনের সমুদ্র যাত্রার পর তিনি বাংলাদেশের পূর্ব বাংলার 'সুদকাঁত্ত' বন্দরে এসে উপস্থিত হন। তখনকার 'সুদকাঁত্ত' এখন চট্টগ্রাম বন্দর। তাঁর হিসাব অনুযায়ী 'সুদকাঁত্ত' পৌঁছতে ইবনে বতুতার সময় লেগেছিল একমাস। শেখ জালাল উদ্দিনের সাথে সাক্ষ্যাৎ ও অতিথ্য গ্রহণ করার ৩দিন পর ইবনে বতুতা মেঘনা নদী দিয়ে প্রথমে হবিগঞ্জ তারপর ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট সোনারগাঁয় পৌঁছেন। এতে তাঁর ১৫ দিন সময়

লেগেছিল। ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনি থেকে সেকালের ৪টি স্থান ও ৩টি নদীর রেখাচিত্র পাওয়া যায়। স্থানের নাম : 'সুদকাঁত্ত' 'কামরু' 'হবংক, ও সুনুরকাঁত্ত' এবং নদীর নাম : গঙ্গা, যুন, নহর-উল আজরক বা মেঘনা নদী।

বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা, ছবি সংগৃহীত

সুনুরকাঁত্ত বা সোনারগাঁও মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত একটি রাজধানী শহর। ঐতিহাসিক সূত্র মতে, সুলতান ফখরুউদ্দিন পূর্ববাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ছিলেন। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই সোনারগাঁয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করে ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুলতানের রাজত্বকালেই ইবনে বতুতা সোনারগাঁও পরিভ্রমণ করেন। ইবেন বতুতার ভ্রমণ কাহিনিতে জানা যায় ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ একজন ন্যায়পরায়ণ সুশাসক এবং পীর দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর সময়ে বিদেশি বণিক, দূত, পর্যটক ও দরবেশদের আনাগোনা ছিল। তিনি চীন, জাভা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের সাঙ্গে সোনারগাঁয়ের বহির বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে বতুতা সোনারগাঁয়ের সুবর্ণ অতীতের অপরিমেয় ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হন। বিস্মিত নেত্রে তিনি অবলোকন করেন বিধাতা যেন দু'হাত ভরে সোনারগাঁয়ের মাটিতে ধন-ঐশ্বর্য দিয়েছেন। মিশরের নীল

নদের তীরে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদরাজির সাথেই যেন এর তুলনা চলে।

ইবনে বতুতার জাহাজ সোনারগাঁও বন্দরে এসে ভিড়লে তিনি প্রাচীর ঘেরা দৃষ্টিনন্দন ইমারত, বড় বাজার, সুদৃশ্য ফোয়ারায় প্রাচ্যের এ রহস্য নগরীকে দেখতে পান। এখানকার সুক্ষ্ম মসলিনের বাহারি বুননশৈলী অবলোকনে ইবনে বতুতা অভিভূত হয়ে পড়েন।

প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম স্বনাধন্য মনীষী শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা জ্ঞানের মশাল নিয়ে সোনারগাঁয়ের অন্ধকার দূর করেছিলেন। সে সময় সুবর্ণগ্রামে রাজা দনুজ রায় বাংলার গভর্নর তুঘরিলের অধীনস্থ জমিদার। এখানে মুসলিম অভ্যুত্থানকালে দনুজ বায় সুবর্ণগ্রাম ছেড়ে চন্দ্রদ্বীপ বা বাকেরগঞ্জ আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঢাকা জেলা গেজেটিয়ারে এটি রয়েছে "Tugnral pushed this Danuzrai our of the present Dhaka District to Chandra Dhip, Now in Bakerganj in 1275 AD গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজ দরবার জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ সুফি এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের ভাব বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল ছিল। শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা সোনারগাঁয় জা'মেয়া/ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সোনারগাঁও তথা পূর্ব বাংলার মুসলিম ঐতিহ্যের সুমহান গৌরবের প্রকৃত কর্ণধার। এ দেশের ইসলামী শিক্ষার পথিকৃৎ আবু তাওয়ামার পাণ্ডিত্য, আধ্যাত্মিক সাফল্য বহু সাধক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে সোনারগাঁও পরিভ্রমণে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁদের মধ্যে ইবনে বতুতা অন্যতম। তিনি জা'মেয়া পরিদর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জানা যায় সোনারগাঁও বন্দর থেকে ইবনে বতুতা সমুদ্রগামী জাহাজে ইন্দোনেশিয়ার জাভাতে গিয়েছিলেন। সোনারগাঁয়ের সোনালি ইতিহাস, স্মৃতি কাহিনি এখনও মানুষকে অতীতের স্মারক চিহ্নের প্রতি লোভাতুর করে তোলে।

ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ের মোগড়াপাড়ায় সুলতানি আমলে রাজধানী থাকাকালীন বিদেশি পর্যটক, পরিব্রাজক রাষ্ট্রদূতগণ শুভাগমন করতেন। জানা যায় এফবি ব্রাডলি বার্ট, স্বরূপচন্দ্র রায়, আহমদ হাসান দানি, এসএম তাইফুর, ড. এম, এ রহিম, আবুল ফজল প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মোগরাপাড়াকে প্রাচীন বাংলার রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন। মোগরাপাড়ায় মুঘল আমলের মসজিদ, সমাধি ব্যতীত মুসলিম ঐতিহ্যের

নিদর্শন নেই বললেই চলে।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ছিলেন মধ্যযুগের দীপ্তিমান সুলতান। ইলিয়াস শাহী বংশের মধ্যে তিনি বহির্বিশ্বে বাংলার সুশাসন, সমৃদ্ধি, সুখ্যাতি সমুজ্জ্বল করেছিলেন। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ নিজে একজন কবি ছিলেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী জ্ঞানী-গুণী কবিদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। পারস্যের ফারসি সাহিত্যের মহাকবি হাফিজ ছিলেন তাঁর বন্ধু। সুলতান নিজে আরবি, ফারসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পত্রালাপ চলতো। গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ মহাকবি হাফিজকে সোনারগাঁয়ে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দীওয়ান-ই-হাফিজে সংকলিত কবিতাটি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের নাম মুসলিম বিশ্বে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। গজলটির দু'টি চরণ

"শেকার শেকান্ শাওয়ান্দ হামে তুতিয়া'নে হিন্দ,
যিন কান্দে পারসী কে বে বাঙ্গা'লে মীরাওয়াদ"
'মিষ্টিমুখ হবে ভারতের তোতারা সবাই
ফারসির এ কান্দ যে আজ বাংলায় যায়।'
"হা'ফেজ যে শাওকে মোজলিসে সুলতা'ন গিয়াসেদ্বীন,
গাফেল মাশো কে কা'রে তো আযনা'লে মীরাওয়াদ"
'হাফেজ সুলতান গিয়াসুদ্দিনের মজলিশের প্রেরণা নিয়ে
উদাসী হয়ো না, তোমার কার্য সিদ্ধ হবে ক্রন্দন দিয়ে।

(বাংলার সভ্যতা নির্মাণে ফারসি, ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী)

এটি বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্যের স্মারক। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ ছিলেন বাংলার গৌরবদীপ্ত মুসলিম শাসক। সোনারগাঁয় কষ্টিপাথরে বাঁধাই করা তাঁর সমাধি এখনও ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে আছে। আলোচিত গজলে কবির কিছু অভিব্যক্তি মানব সভ্যতার ইতিহাসে বাংলার অসামান্য গুরুত্বের সাক্ষ্য বহন করে। নতুন করে উপলব্ধি করছি এর মাধ্যমে আমাদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মেলবন্ধন সৃষ্টি করবে। এতে হাজার বছরের প্রাচীন, প্রার্চুযময় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থানকে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে উপস্থাপনের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

বাংলায় বিদেশি পর্যটক টাভার্নিয়ার, সময়কাল : ১৬৬৬ খ্রি.

সহায়ক গ্রন্থ

১. SONARGAON, Dr. S. M. Hasan, Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation 1982

২. সোনারগাঁ উপজেলা উন্নয়ন প্রোফাইল, ডিসেম্বর ২০০৪

৩. সোনারগাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান, অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম, ডক্টর সৈকত আসগর সম্পাদিত, জুলাই ১৯৯৩

৪. সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস, স্বরূপচন্দ্র রায়, কলকাতা ১৮৯১

৫. R.C. Majumder History of Bengal.vol.1 Dacca 1970

৬. ইতিহাসে সোনারগাঁও, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ১৯৭৯

৭. M.A. Rahim Social and Cultural History of Bangal. vol,11. Dacca 1967

৮. ব্যবসায় উদ্যোগ, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা ২০১২

৯. ঐতিহ্য, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন জুন ২০০৮

১০. Soanrgaon-Panam Asiatic Society of Bangladesh, March 1997

১১. বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ, আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা

১২. বাংলায় নীল চাষ ও নীলবিদ্রোহের ইতিহাস, রাজীব আহমেদ গতিধারা, ঢাকা ১১০০

১৩. Muslim Architecture in Bangal Pro. A.H. Dani. p.237

১৪. Archaeological Survey of India Report by sir A. Cunnighan xv.p143

১৫. পূর্ববঙ্গঃ মৈমনসিংহ-গীতিকা, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর বি.এ, ডি.লিট,পৃষ্ঠা নং ৪০

১৬. প্রশান্তি, ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা ২০১২ ঈশা খাঁ ফাউন্ডেশন

১৭. বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড ৪, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

১৮. S. M. Taifoor. Glimpses of old Dacca 1952

১৯. প্রাগুক্ত ৩ পৃষ্ঠা নং ২০৩, ২০৫

২০. প্রাগুক্ত ১৭, খণ্ড ৯

২১. প্রাচীন নগরী সোনারগাঁও, শামসুদ্দোহা চৌধুরী, প্রকৃতি ২০১৫

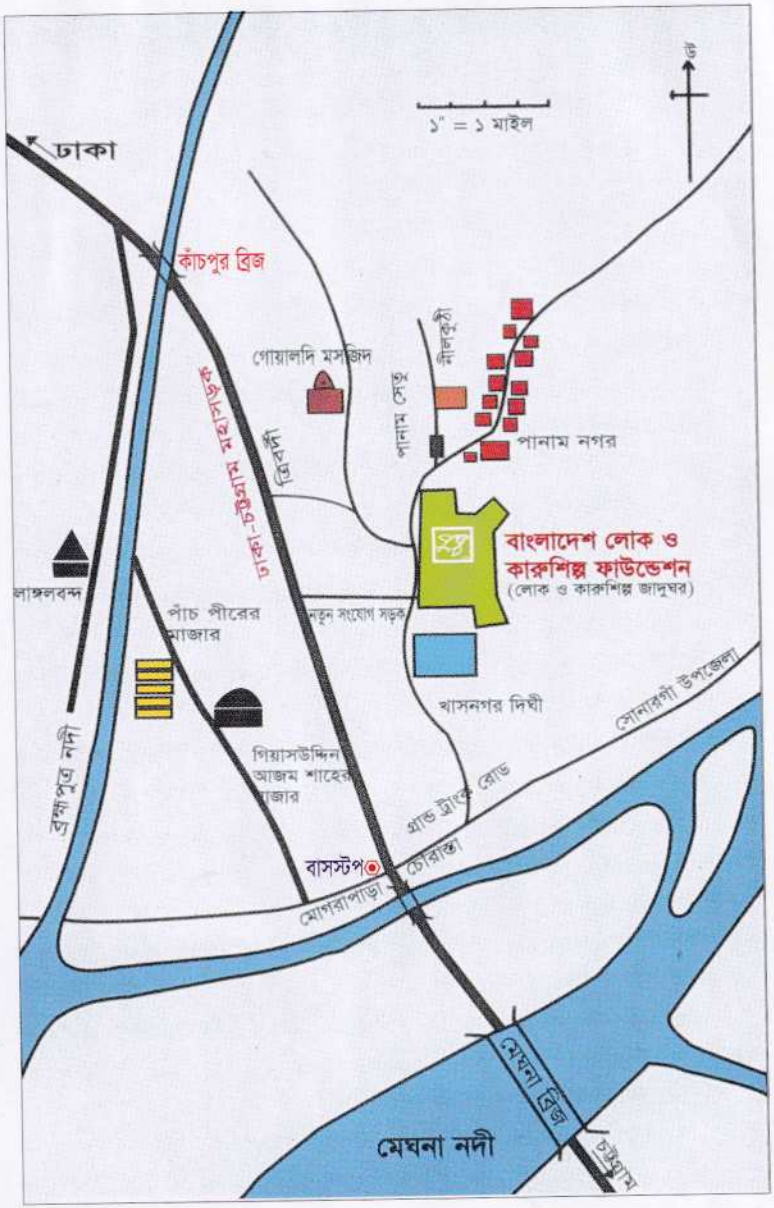
১" = ১ মাইল
ঢাকা
কাঁচপুর ব্রিজ
গোয়ালদি মসজিদ
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক
ত্রিবেণী
পানাম সেতু
পানাম নগর
বাংলাদেশ লোক ও
কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
(লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর)
লাঙ্গলবন্দ
পাঁচ পীরের
মাজার
নতুন সংযোগ সড়ক
খাসনগর দিঘী
সোনারগাঁ উপজেলা
ব্রহ্মপুত্র নদী
গিয়াসউদ্দিন
আজম শাহের
মাজার
গ্রান্ড ট্রাংক রোড
বাসস্টপ
চৌরাস্তা
মোগরাপাড়া
মেঘনা ব্রিজ
মেঘনা নদী
চট্টগ্রাম

লোকেশন মানচিত্র